পাক্ষিক

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ১৮ শ সংখ্যা

১৬ই মাঘ, ১৩৮৬ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮০ ইং : ১২ই রবিঃ আউঃ, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

'খতমে-নবুয়ত' সংখ্যা

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮০ইং | ৩৩শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* কুরআন শরীফের আলোকে খতমে-নবুয়তের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
* হাদীস শরীফের আলোকে খতমে-নবুয়তের প্রকৃত অর্থ	মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	১০
* শীর্ষস্থানীয় সর্বজনস্বীকৃত বুজুর্গানে-উম্মতের দৃষ্টিতে খতমে-নবুয়ত সংক্রান্ত সর্বসম্মত আকীদা বা অভিমত	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৩
* আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে খতমে-নবুয়তের তাৎপর্য	সংকলন ও অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৮
* খতমে-নবুয়ত—রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনন্য মর্যাদা	হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহ্‌মদ, খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আউঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	২২
* বিশেষ জ্ঞাতব্য :	জনাব ভিজির আলী, জেনারেল সেক্রে-টারী, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	৩২
* সীরাতুন-নবী (সাঃ) [কবিতা]	চৌধুরী আবদুল মতিন	
* জলসায় যোগদান কারীদের জন্য কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়	সেক্রেটারী, জলসা কমিটি	

সিরাতুন নবী (সাঃ) দিবস উদ্‌যাপিত

পবিত্র ১২ই রবিউল আওয়াল ১৪০০ হিঃ (৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮০ ইং) ঢাকা জামাতে আহমদীয়ায় মহা জাঁকজমক ও পরম শ্রদ্ধা ও উদ্দীপনার সহিত পবিত্র ঈদ-মীলাদুন্নবী দিবস উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা ঢাকা কেন্দ্রির আহমদীয়া মসজিদে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতাবরম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে সরওয়ারে কায়েনাত খাতামান্নাবীয়ীন হযরত রসুল আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর সর্বগুণে গুণান্বিত মহান জীবনী ও সীরাত এবং তাঁহার চিরস্থায়ীকল্যাণ প্রবাহমানতা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ আলোক পাত করেন মোহতাবম আমীর সাহেব এবং অন্যান্য বক্তাগণ, যাহাদের মধ্যে ছিলেন মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী, মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী. শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, মৌঃ মকবুল আহ্‌মদখান, (আমীর ঢাকা)। এতদ্ব্যতীত, মসজিদের উপর মনোরম আলোকসজ্জাও করা হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

১৩ই মাঘ, ১৩৮৬ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮০ইং : ৩১শে সুলাহ্ ১৩৫৯ হিজরী শামসী

কুরআন শরীফের আলোকে

খতমে-নবুয়তের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ

সৃষ্টির সেরা মানুষ। কেননা একমাত্র মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইল আল্লাহ্-তায়ালার এবাদত পালন পূর্বক তাঁহার আব্দ্ হওয়া অর্থাৎ তাঁহার অনুগত্যের দর্পনে তাঁহার মা'রেফত বা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার অনুগত, প্রেমিক ও প্রিয় এবং ঐশীগুণাবলীর আধারে পরিণত হওয়া। "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওল্ইনসা ইল্লা লে-ইয়া'বুদুন" – অর্থাৎ 'আমি সকল শ্রেণীর মানুষকে আমার এবাদত পালন ও আব্দ্ হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি' – পবিত্র আয়াতে এবং "কুন্তু কানযাম-মাখফিয়ান ফা-আহ্বাবতু আন উ'রাফা ফা-খালাক্তু আদাম"— অর্থাৎ 'আমি এক প্রচ্ছন্ন ভাণ্ডার স্বরূপ ছিলাম, অতঃপর আমি পরিচিত ও প্রকাশিত হওয়া পছন্দ করিলাম, সেজন্য আদমকে সৃষ্টি করিলাম'—পবিত্র হাদিসে মানব সৃষ্টির উক্ত উদ্দেশ্য ও উহার বাস্তবায়নের মূলতত্বটিই বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত পবিত্র ও মহান উদ্দেশ্য সফলের জন্য আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে যথোপযুক্ত যাবতীয় শক্তি ও উপাদান দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা অন্য কোন জীবকে তিনি দান করেন নাই এবং যুগে যুগে উক্ত উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে সঠিক ও সরল পথের নির্দেশ দান করেন, আর উহার মূর্তিমান আদর্শ পেশ করেন মানব জাতির উৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা নবী-রসুলগণ, তারপর তাঁহাদের পবিত্র ও পূর্ণ অনুসারীবৃন্দ। আর সকল নবী-রসুলের মধ্যে অনন্যসাধারণ অদ্বিতীয় মর্যদার অধিকারী শ্রেষ্ঠতম রসুল হইলেন পূর্ণ-মানব হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম – তাঁহাতেই বিকাশ ঘটিয়াছে নবুয়ত ও রেসালতের পূর্ণতম জ্যোতি ও গুণরাজীর। মোকামে-মুহাম্মদীয়াতের এই সর্বোচ্চ ও অনন্য আসনে পৌঁছার সাধ্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে কাহারই নাই। জগতে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম – ইসলাম হইল একমাত্র জীবন্ত ও চিরস্থায়ী ধর্ম এবং তাঁহার উপর অবতীর্ণ শরীয়ত বা জীবন-বিধান মহা-গ্রন্থ আল-কুরআন

হইল পূর্ণ ও পরিণত চির কল্যাণবর্ষী হেদায়েত এবং সর্বশেষ শরীয়ত। সেইজন্য তাঁহার অনুসারীবৃন্দ আখ্যাত হইলেন 'খাইরে উম্মত' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া তাৎপর্যবহ গৌরবময় নামে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার পবিত্র কালামে এ ঘোষণাই করিয়াছেন :

"কুন্‌তুম খাইরা উম্মাতিন উখ্‌রেজাত লিন্নাসে" অর্থাৎ, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত যাহাদিগকে মানবজাতির কল্যাণার্থে সৃষ্টি করা হইয়াছে।'

শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফলের ক্ষেত্রে এই উম্মতের কার্যতঃ শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হওয়া ও কায়েম থাকা অত্যাবশ্যকীয়। অন্যথায়, ফাঁকা দাবী বই আর কিছুই ইহার মূল্য থাকে না। সেইজন্য কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই উম্মতের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পবিত্র কুরআনের কামিল শিক্ষা অনুসারে চলিয়া শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম রসূল (সাঃ)-এর অনুবর্তিতায় ও তাঁহারই আত্মিক কল্যাণ প্রসাদে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের পূর্ণ সুফলসমূহ অর্থাৎ সকল প্রকারের রুহানী নে'মতের অধিকারী হইতে থাকিবেন। শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম রসূল (সাঃ) এবং পূর্ণ ও পরিণত ধর্ম-বিধান কুরআন শরীফের অনুসারী হিসাবে শ্রেষ্ঠ উম্মতের পক্ষে ইহাই শোভনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত ছিল বলিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা তাঁহার নৈকট্য লাভের চারি শ্রেণীর সুফল বা নে'মতের ওয়াদা দান করিয়াছেন। যথা—(১) সালেহীন, অর্থাৎ সেই সকল লোক যাহারা সত্য ও সৎকর্মের পথে পরিচালিত হইয়া উহার উপর উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন। (২) শহীদ অর্থাৎ সেই সকল আত্মনিবেদিত ব্যক্তি যাহারা সত্যের পথে নিজেদের জীবনকে বিলীন করিয়া দেন। (৩) সিদ্দীক অর্থাৎ সেই সকল মনীষা, যাহারা সত্যের প্রতীক বা প্রতিমূর্তি হইয়া যান এবং তাঁহাদের আকায়েদ ও আমল এবং কথায় ও কাজে লেশ মাত্র ব্যবধান বা ভিন্নতা অবশিষ্ট থাকে না। (৪) নবী বা রসূল, অর্থাৎ যাঁহারা আল্লাহতায়ালার পূর্ণ ও পরিণত নৈকট্যে উন্নীত হইয়া খোদাতায়ালার পবিত্র বাণী ওহী ও এলহাম) যোগে বহুল পরিমাণে গায়েব ও হেদায়েতের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং অজ্ঞেয় বিষয়াবলীর সংবাদ লাভে ভূষিত হইয়া জামানার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষের সংস্কার ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে মনোনীত ও প্রেরিত হন।

নবী শব্দের অভিধানিক অর্থও ইহাই। যথা—"আল-মুখবেরু আনিল মস্তাকবিলে বে-ইলহামিম মিনাল্লাহে।" (আল-মুনজেদ)

অর্থ—'আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এলহাম (ঐশীবাণী) যোগে ভবিষ্যত সংবাদ বক্তা।'

ইসলামী পরিভাষা হিসাবেও নবী-রসূলের ব্যাখ্যায় আকায়েদ বা ধর্ম-বিশ্বাস সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ও সর্ব-স্বীকৃত গ্রন্থ 'নিব্রাসে' লিখিত আছে :

"ওয়া কুল্লুহুম কানু মুখবেরীনা মুবাল্লেগীনা আনিল্লাহে তায়ালা লেয়ান্না হাযাল ইখ্‌বারু ওয়াত-তব্‌লীগু মা'নান-নবুয়াতে ওয়ার-রেসালতে। আন্নাবীইউ ইউখবেরু ওয়ার-রসূল মাই ইউবাল্লেগু।" ('নেব্রাস'—পৃঃ ৫০, ৪৫১)

অর্থাৎ, তাঁহারা (নবী-রসুল) সকলই আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে ভবিষ্যতের সংবাদ দাতা এবং মানুষের মধ্যে প্রচারকারী ছিলেন। কেননা অনুরূপ সংবাদ দান এবং প্রচারই হইল নবুয়ত ও রেসালতের অর্থ।'

কুরআন শরীফেও আল্লাহতায়ালা নবুওত ও রেসালাতের হকিকত ও সংগা নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন: "আলেমুল গাইবে ফা-লা ইউয্হেরু আলা গাইবিহি আহাদান ইল্লা সানেরতাযা মিররসুলিন। (সূরা জিন: ২৬, ২৭)

অর্থাৎ, 'অজ্ঞেয় সম্বন্ধে জ্ঞাত একমাত্র আল্লাহতায়ালা, এবং যাহাকে তিনি রসুলরূপে মনোনীত করেন, একমাত্র সেই ব্যক্তির নিকটই তিনি তাঁহার গায়েব বা অজ্ঞেয় বা গোপন রহস্যসমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন।" ('এযহার আলা'-এর অর্থ প্রাধান্য দান, অন্য কথায়, বহুল পরিমাণে প্রকাশ করা।)

অতএব, পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে বহুল পরিমাণে গায়েব বা ভবিষ্যতের গোপন রহস্য ও সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার নাম নবুয়ত এবং উহা মানুষের নিকট তাহাদের হেদায়েত ও সংস্কারার্থে পৌঁছাইবার বা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র মনোনীত ও প্রেরিত ব্যক্তিকে 'রসুল' বলা হয়। অন্য কথায়, আল্লাহ্র তরফ হইতে বহুল পরিমাণে গায়েব-প্রাপক প্রেরিত ব্যক্তিকে কুরআন শরীফে নবী ও রসুল বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

শরীয়ত-বিহীনও নবী-রসুল হইতে পারেন এবং মানব ইতিহাসে তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। সেইজন্য কুরআন শরীফে শরিয়ত-বাহী ও শরীয়ত-বিহীন উভয়ের জন্য নবী ও রসুল শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য বা ভেদাভেদ করা হয় নাই। (যথা সুরা মরিয়ম: ৪র্থ রুকু)। অবশ্য শরীয়ত-বাহী নবীর সেলসেলা বা উম্মতের মধ্যেই শরীয়ত-বিহীন নবীগণের আগমন হইয়া থাকে সংস্কারক রূপে ও সেই শরীয়তের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমে বলেন:

"ওয়া আতাইনা মুসাল কিতাবা ওয়া কাফ্ফাইনা মিম বা'দিহি বির-রুসুলি।"

(আল-বাকারাহ: ৮৮)

"ইন্না আনযালনাত-তওরাতা ফিহা হুদাও ওয়া নুর ইয়াহ্কুমু বিহান নবীইউনাল-লাযিনা আসলামু লিল্লাযীনা হাদু।" (সূরা আল-মায়েদা: ৪৫)

অর্থাৎ—"আমরা মুসাকে কিতাব (তৌরাত-শরীয়ত) দান করিয়াছিলাম এবং মুসার পরে তাঁহার অনুবর্তিতায় ক্রমাগত বহু রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম।' (সুরা বাকারাহ: ৮৮ আয়াত)

'আমরা (মুসার উপর) তৌরাত অবতীর্ণ করিয়া ছিলাম, উহাতে ছিল বনি ইস্রাইলের জন্য হেদায়েত ও নুর এবং সেই শরীয়তকেই স্বীকৃতিদান করিয়া, উহারই নির্দেশ অনুযায়ী মুসার পরে আগমনকারী নবীগণ ইহুদীদের মধ্যে দ্বীনি বিষয়াবলীর ফায়সালা করিতেন।"

(সুরা মায়েদা: ৪৫ আয়াত)

উপরে উল্লেখিত আয়াত সমূহের দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, নবুয়তের একটি মূল কাঠামো বা সংগা রহিয়াছে এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনী নীতি ও নির্দেশ হইল এই যে, "লা নুফাররেকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহি"—অর্থাৎ, মুমেনগণ বলিবে যে, আমরা নবী-রসুলগণের মধ্যে কোন প্রভেদ করিনা—রেসালত বা নবুয়তের মূল সংগা অনুসারে তাঁহারা সকলে একই গণ্ডীভুক্ত—বিনা ব্যতিক্রমে সকলের উপরই ঈমান রাখিতে হইবে ; কিন্তু "তিলকার রুসুলু ফায্যালনা বা'যাহুম আলা বা'যিন"—অর্থাৎ, 'তাহাদের মধ্যে কতজনকে আমরা কতক-জনের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছি"—আয়াত অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের মধ্যে প্রকার-ভেদও আছে এবং কুরআন অনুযায়ী তাহা নিম্নরূপ ঃ

(১) শরীয়ত-বাহী নবুয়ত, অর্থাৎ যে নবুয়তের সহিত কোন নুতন শরীয়ত অবতীর্ণ হইয়া থাকে। যেমন, হযরত মুসা (আঃ) অথবা সৈয়দেনা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়ত ছিল। এরূপ নবওতকে কোন কোন সময় ইসলামী পরিভাষায় 'হকীকী নবুওত' নামেও অবিহিত করা হয়। এই নাম ইহাকে এজন্য দেওয়া হইয়াছে যে শরীয়ত-বাহী নবুয়তের সূত্র ধরিয়াই নবুওতের প্রতিটি সেলসেলা বা শৃঙ্খলের সূচনা হইয়া থাকে এবং অন্য প্রকারের নবুওত উহার পাশ্চাতে আসিয়া থাকে। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে প্রকৃত প্রস্তাবে শরীয়ত-বাহী নবুওতই 'হকীকী নবুওতের' নাম পাওয়ার উপযুক্ত।

(২) দ্বিতীয় প্রকার নবুওত হইল শরীয়ত-বিহীন নবুওত অর্থাৎ যে নবুওতের সহিত কোন নতুন শরীয়ত নাজেল হয় না। যদিও উহা মুস্তাকিল বা স্বাধীন নবুওত হইয়া থাকে যাহা সরাসরি ও সাক্ষাৎভাবে খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে দানকৃত হয় এবং উহাতে কোন পূর্ববর্তী নবীর অনুবর্তিতা ও কল্যাণ প্রবাহের অংশীদারীত্ব থাকে না। যেমন হযরত দাউদ (আঃ), সোলেমান (আঃ), ইয়াহিয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওত ছিল। তাঁহারা মুসায়ী শরিয়ত তৌরাতের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ভারপ্রাপ্ত খাদিম হিসাবে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নবুওত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুবর্তিতা ও ফয়েজ বা কল্যাণ প্রবাহের কোনও প্রভাব বা অংশ ছিল না বরং তাঁহারা সরাসরী এবং স্বাধীনরূপে মনোনীত হইয়া নবুওতের পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে 'মুস্তাকিল নবুওত' নামেও অভিহিত করা হয়। কেননা মুস্তাকিল বলিতে এরূপ জিনিস বুঝায় যাহা অন্য জিনিসের উপর নির্ভর-ব্যতিরকেই স্বীয় সত্তায় কায়েম হয়।

(৩) উল্লিখিত দুই প্রকারের নবুওতের পর যেহেতু আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনন্য-সাধারণ ব্যক্তি-সত্তায় নবুওতের যাবতীয় পরিণত কল্যাণ ও জ্যোতির পূর্ণতম সমাবেশ ঘটে এবং তিনি এলাহী নৈকট্যের উচ্চতম মার্গে উন্নীত হইয়াছেন, যথানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাহারো পক্ষে পৌঁছান সম্ভব নয়, এবং শরীয়তও তাঁহাকে পূর্ণ ও চির কল্যাণবর্ষীরূপ দান করা হইয়াছে যাহার পর নুতন কোন শরীয়ত আসিবে না এবং উহার কোন প্রয়োজনও হইতে পারে না, সেইহেতু তাঁহার আগমনের পর পবিত্র কুরআনের অধীনে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে শরীয়ত-বিহীন উম্মতী বা জিল্লি

নবুওতের পুরস্কার লাভের দুয়ার খোলা রাখা হইয়াছে। এরূপ নবুওতের সহিত কোন নূতন শরীয়ত আসে না অথবা মওজুদ শরীয়তের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধনও হয় না। তেমনিভাবে কেহ উক্ত প্রকারের নবুয়ত এই পূর্ণতম শরীয়তবাহী নবীর (সাঃ) অনুবর্তীতা ও কল্যাণ ব্যতিরেকে স্বাধীন ও সরাসরিরূপে লাভ করিতে পারেন না, বরং উহা একমাত্র আপন পূর্ণতম নবীর অনুবর্তিতায়, তাঁহারই ফয়েজ ও কল্যাণে, প্রতিবিম্ব স্বরূপ লাভ হইয়া থাকে। এবং যেহেতু জিল্ল, অর্থ প্রতিবিম্ব, সেইহেতু এরূপ নবুওত আপন প্রভু ও প্রিয় নবীর নবুয়তেরই প্রতিচ্ছায়া ও অংশবিশেষ হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র কোন কিছু নয়। উহা উম্মতী নবুয়ত বলিয়াও অভিহিত, যাহা একমাত্র আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুবর্তিতার কল্যাণ প্রবাহে প্রকাশ পাওয়া নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রথমোক্ত দুই প্রকারের নবুওত অর্থাৎ শরীয়ত-বাহী এবং শরীয়ত-বিহীন স্বাধীন (মুস্তাকিল) নবুওত হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর পরে আর কখনও হইতে পারে না বরং উক্ত দুই প্রকারের নবুওতের পূর্ণ ও পরিণত রূপ ও আধার হিসাবেই হযরত নবী আকরাম (সাঃ) আখেরী ও সর্বশেষ নবী। ইহাতে কাহারো দ্বিরুক্তি থাকিতে পারে না। কেননা ইহা সর্বস্বীকৃত বিষয় যে, তাঁহার পরে কোন শরীয়ত-ধারী নবী আসিতে পারেন না এবং এমন কোন নবীও হইতে পারেন না যিনি তাঁহার (সাঃ) অনুবর্তিতা ও কল্যাণ প্রবাহের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে নবুওত লাভে সক্ষম হন। এইরূপে একমাত্র তিনিই (সাঃ) আখেরী নবী। আর তৃতীয় প্রকার নবুওত অর্থাৎ উম্মতি ও যিল্লি নবুওতের ক্ষেত্রেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ ক্ষেত্রেও হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-ই আখেরী নবী হিসাবে থাকিয়া যান কেননা তাঁহার অনুবর্তিতায় তাঁহারই কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি প্রতিচ্ছায়া বিশেষ নবুওত লাভ করে সে তাঁহারই শাখা ও তাঁহারই অংশবিশেষ, স্বতন্ত্র কোন কিছুই না। তাহার সত্তা শুধু একটি আয়না বা দর্পণ বিশেষ, যাঁহার মধ্যে চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সূর্যের আলো ও কিরণসমূহ প্রতিবিম্বিত হয়, উহার অতিরিক্ত কোনকিছু নয়।

হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর অনুবর্তিতায় তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত এই প্রকারের নবুওতসহ পূর্ববর্তীগণের সকল নেয়ামতের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে বলিয়া কুরআন শরীফে সুস্পষ্টরূপে ওয়াদা দান করা হইয়াছে। যেমন, আল্লাহতায়ালা বলেন:

"ওয়া মাই ইউতেয়েল্লাহা ওয়ার-রসুলা ফা-উলায়েকা মায়াল্লাযীনা আনয়ামাল্লাহু আলাইহিম মিনান-নবীয়ীনা ওয়াস-সিদ্দিকীনা ওয়াশ্‌শুহাদায়ে ওয়াস্-সালেহীন, ওয়া হাসুনা উলায়েকা রফীকা। যালিকাল ফায্‌লু মিনাল্লাহে ওয়া কাফা বিল্লাহে আলীমা।" (সুরা আল-নিসা, রুকু ৯)

অর্থ—"যাহারা আল্লাহ এবং এই মহান রসুলের অনুবর্তীতা করিবে, তাহারা আল্লাহ যাহাদিগকে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ রূপে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ও সমর্যাদায় সমাসীন হইবে। তাহারা পরস্পর উত্তম সাথী। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে বিশেষ কৃপা। অসীম জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।" (সুরা নেসা—আয়াত ৮০-৮১)

এই আয়াতে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্যকার অনুবর্তীগণের জন্য খোদাতায়ালার নৈকট্যের সকল প্রকার পুরস্কার লাভের দুয়ার খোলা রহিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারা স্ব স্ব ক্ষমতা ও যোগ্যতানুসারে নবীও হইতে পারেন, সিদ্দিকও হইতে পারেন, শহীদও হইতে পারেন এবং সালেহ্‌ও হইতে পারেন এবং ইহারা এইরূপে মর্যাদাসম্পন্ন যে, তাহাদের পারস্পরিক সঙ্গ তাহাদের একে অন্যের পক্ষে বড়ই কল্যাণময় ও উত্তম পরিচয় বহন করে। সুতরাং তাহারা পরস্পর উত্তম সঙ্গী তখনই হইতে পারেন যখন পূর্ববর্তী উম্মতের নবী-গণের ন্যায় এই উম্মতের মধ্যেও নবী হইবেন, যেমন সিদ্দিক ও শহীদ এবং সালেহ্‌ও হইবেন। এই উম্মতে নবী না হইতে পারিলে এই উম্মতের কেহই সিদ্দিক, শহীদ বা সালেহও হইতে পারিতেছেন না, কেননা ইহা 'খাইরে-উম্মত' উপাধির পরিপন্থি এবং আলোচ্য আয়াতে একই সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বর্ণিত চারিটি পুরস্কার দানের ওয়াদার বরখেলাফ। সুতরাং উহাদের একটিকে বাদ দিয়া বাকী তিনটিকে জারী রাখা যায় না। এই উম্মতের ব্যক্তিরা যদি শুধু স্থান, কাল ও পাত্রের দিক দিয়া কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণের শুধু বাহ্যতঃ সঙ্গী হইবেন, নিজেরা ইহজীবনে ও পরকালে এই সকল মর্যাদার অধিকারী হইবেন না, তাহা হইলে তাহারা 'পরস্পর উত্তম সাথী' বলিয়া কিরূপে সাব্যস্ত হইতে পারেন ? উত্তম সাথী হওয়ার জন্য সমমর্যাদা ও সমগুণ সম্পন্ন হওয়া জরুরী। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য আয়াতের মধ্যে 'পূর্ববর্তী' বা 'কিয়ামত কথার কোথাও উল্লেখ বা ইশারা নাই। আরবী ভাষায় 'মাআ' (সহিত) শব্দের অর্থ স্থান, কাল ও পাত্র ব্যতীত মর্যাদা ও গুণে একত্র হওয়া বুঝায়। (মুফরাদাত-ইমাম রাগির, পৃঃ ৪৯৬) সুতরাং আলোচ্য আয়াতে 'মায়া' শব্দের শেষোক্ত অর্থই প্রযোজ্য—বরং অপরিহার্য। তেমনিভাবে কুরআন শরীফের বহু স্থানে 'মায়া' শব্দ 'মিন' (অন্তর্ভুক্ত) অর্থেই ব্যবহার হইয়াছে। যেমন, "তাওয়াফ্‌ফানা মায়াল আবরার" (আলে-ইমরান : ১৭৬) অর্থাৎ, "পূণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ও তাহাদের মর্যাদা ও গুণসম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে ওফাত দান কর।' 'মায়া' শব্দের কারণে কেহই এ দোয়ার এই অর্থ করেন না যে, 'যখন নেক ব্যক্তিদের মৃত্যু ঘটে তখন তাহাদের সঙ্গে আমাদিগকেও মৃত্যুদান কর।' এতদ্ব্যতীত আলোচ্য আয়াতে 'মাআ' শব্দটি 'আন-নবীয়ীন' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আসে নাই বরং 'আনয়ামাল্লাহু আলাইহিম'-অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌ কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্তগণ'-বাক্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া আসিয়াছে, যাহাদের মধ্যে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্‌ সকলই শামিল রহিয়াছেন। যদি 'মায়া' শব্দের কারণে এই আয়াতের অর্থ এই করা হয় যে, কোনও মুসলমান হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর শিষ্যত্ব ও অনুবর্তিতার ফলশ্রুতিতে নবুয়তের পুরস্কার লাভ করিতে পারিবে না, শুধু বাহ্যিকভাবে নবী-গণের সঙ্গ লাভ করিবে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, নাউযুবিল্লাহ্‌ কোন মুসলমান আদৌ পুরস্কার-প্রাপ্তগণের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না এবং নবী তো দূরে থাকুক, এমন কি সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহও হইতে পারিবে না। প্রত্যেক মুসলমান অতি সহজেই বুঝিতে পারেন যে এই প্রকারের কদর্থ স্পষ্টতঃ বাতিল।

বস্তুতঃ আমাদের শ্রেষ্ঠতম রসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মর্যাদাসম্পন্ন উম্মতের জন্য তাঁহার অনুবর্তিতায় তাহাদের স্ব স্ব ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ হওয়ার পুরস্কারসমূহ ব্যতীত উম্মতি ও যিল্লি নবুয়তের পুরস্কার পাওয়ার পথও খোলা রহিয়াছে। "যালিকাল ফাযলু মিনাল্লাহে ওয়া কাফা বিল্লাহে আলীমা"—"ইহাই আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্ধারিত বিশেষ কৃপা (যাহা এই মহিমান্বিত রসুল এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ উম্মতের সমোচীত মর্যাদার কারণ) ; অসীম জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

প্রসিদ্ধ তফসির-গ্রন্থ "বাহরুল-মুহীত"-এ সুরা নিসার আলোচ্য আয়াতের অর্থ নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে :

"প্রকাশ থাকে যে, এই আয়াতে উহার 'মিনান-নাবীয়ীন' অংশ 'আন-আমাল্লাহু-আলাইহিম' অংশের ব্যাখ্যা করিতেছে। অন্য কথায় বলা হইয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও রসুলের অনুবর্তিতা করিবে, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে পূর্ববর্তী পুরস্কারপ্রাপ্ত লোকদের সহিত মিলিত করিবেন। ইমাম রাগেব বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, তাঁহাদিগকে বর্ণিত চারি শ্রেণীর পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সহিত মর্যাদা এবং পুরস্কারে সম্মিলিত করা হইবে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যিনি নবী হইবেন, তাঁহাকে নবুওতের মর্যাদা ও পুরস্কারে নবীর সহিত সমাসীন করা হইবে; যিনি সিদ্দিক হইবেন, তাঁহাকে সিদ্দিকিয়তের মর্যাদায় সিদ্দিকের সহিত, শহীদকে শাহাদাতের মর্যাদায় শহীদের সহিত এবং সালেহকে সালেহিয়তের মর্যাদায় সালেহের সহিত সমাসীন করা হইবে।" (তফসীর 'বাহরুল মহীত' ৩য় খণ্ড, ২৮৭পৃঃ মিশরে মুদ্রিত সংস্করণ)

বাহ্‌রুল-মুহীতে'র এই ব্যাখ্যায় বর্ণিত ইমাম রাগিবের উক্তি 'আন্নবীইউ বিন্নবীয়্যে'—('তোমাদের মধ্যে যিনি নবী হইবেন, তাহাকে নবীর সহিত মিলিত করা হইবে)—'দ্বারা আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী দুইটি কথার চরম মীমাংসা হইয়া গেল—

(১) রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুবর্ত্তীতায় এই উম্মতে নবী হইবেন, যেমন এই উম্মতে সিদ্দিক ও শহীদ এবং সালেহও হইবেন।

(২) এই উম্মতের নবী নবীগণের জামাতের অন্তর্ভুক্তও হইবেন, যেমন এই উম্মতের সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ উক্ত শ্রেণীর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

এতদ্ব্যতীত, 'উম্মুল-কিতাব' সুরা ফাতেহায় সকল প্রকারের এনয়াম বা পুরস্কার লাভের জন্য খোদাতায়ালা নিজে দোওয়া শিক্ষা দিয়াছেন যাহা প্রতিটি বা-আমল মুসলমান প্রত্যহ কমপক্ষে ৩০ বার করিয়া নামাজে পাঠ করিয়া থাকেন :

"ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আনয়ামতা আলাইহিম ; গাইরিল মাগযুবে আলাইহিম ওলায্‌যাল্লীন।"

অর্থ—'হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাদিগকে (রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতায়) সেই সরল পথে পরিচালিত কর যাহা তোমার পক্ষ হইতে পুরস্কার-প্রাপ্তগণের পথ ; তাহাদের পথে নয় যাহারা তোমার অভিশাপগ্রস্ত এবং তাহাদের পথেও নয় যাহারা পথভ্রষ্ট।'

উক্ত আয়াত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীদের জন্য পূর্ববর্তীদের সকল প্রকারের পুরস্কার প্রাপ্তির কল্যাণময় আশ্বাস ও সুসংবাদের পাশাপাশি ঐ সকল পুরস্কার হইতে বঞ্চিত না হওয়ার ভয়াবহ সতর্কবাণীও বহন করিতেছে। কেননা কুরআন করীম এবং বহুল বর্ণিত হাদিসসমূহ অনুযায়ী 'মগযুব' এবং 'যাল্লীন' বলিতে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানগণকেই বুঝান হইয়াছে, যাহারা নবুয়তসহ সকল প্রকারের রুহানী পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইয়া উক্ত দুই নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অতুলনীয় দোওয়ার প্রথমাংশে এই মর্যাদাসম্পন্ন উম্মতের জন্য হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর প্রদর্শিত সেরাতে-মুস্তাকীমে পরিচালিত হইয়া ও কায়েম থাকিয়া নবুয়ত সহ সকল প্রকারের পুরস্কার লাভের পথকে সুগম ও প্রশস্ত করা হইয়াছে। আর ইহার শেষাংশে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য সতর্ক করা হইয়াছে।

পবিত্র কুরআন আল্লাহতায়ালার অফুরন্ত তত্বপূর্ণ কালাম। ইহাতে পরস্পর বিরোধী কথা থাকিতে পারে তাহা কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ্তায়ালাও ইহাকে পবিত্র কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রমাণ হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন (নেসাঃ ৮২) বরং কুরআন শরীফের ইহাও অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, ইহার একাংশের ব্যাখ্যা অপরাপর অংশ করিয়া থাকে। কুরআন শরীফের বহু আয়াতে একথার দাবী ও প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং সুরা আহযাবের পঞ্চম রুকুতে হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছে ঃ "তিনি তোমাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের কাহারও পিতা নহেন কিন্তু তিনি আল্লাহ্র রসুল এবং খাতামান্নবীয়ীন। এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে অসীম জ্ঞানের অধিকারী"—উক্ত আয়াতে বর্ণিত খাতামান্নবীয়ন পদের নিশ্চয় এরূপ কোন অর্থ হইতে পারে না, যাহা পবিত্র কুরআনের অগণিত আয়াতে দ্বের্থহীন ভাষায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত বিষয়ের বিরোধী হয়। আমরা উপরের আলোচনায় মাত্র দুইটি অতি স্পষ্ট আয়াত দ্বারা দেখাইয়াছি যে, কুরআন শরীফ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আত্মিক কল্যাণে তাঁহার অনুবর্তিতায় উম্মতী নবুয়ত সহ সকল প্রকারের পুরস্কার লাভের পথ খোলা রাখিয়াছে। সুতরাং 'নবুয়তের পুরস্কারকে খতমকারী' বলিয়া 'খাতামান্নাবিয়ীন' পদের অর্থ হইতে পারে না। তেমনি ভাবে আরবী ভাষায় খাতামুল-আওলিয়া, খাতামুল-মুহাজেরীন, খাতামুল-মুহাদ্দেসিন ইত্যাকার বহুলরূপে ব্যবহৃত দৃষ্টান্ত গুলিতে খাতাম শব্দের অর্থ শেষ বা অবসানকারী বলিয়া কেহই করেন না। কেননা ঐরূপ অর্থ হইতে পারে না। সুতরাং খাতামান্নবিয়ীন-এর ক্ষেত্রেও ঐ অর্থ প্রযোজ্য হইতে পারে না। বরং 'খাতাম' শব্দ কোন বহুবচনের সহিত সংযুক্ত (মুযাযাফ) হইলে সমগ্র আরবী সাহিত্যে এরূপ পদের অর্থ হইয়া থাকে 'পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ; শেষ বা অবসানকারী অর্থ করা আরবী ব্যকরণ ও বাগধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং খাতামান্নবীয়ীন-এর অর্থ নবীগণের শ্রেষ্ঠ।

বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা উক্ত আয়াতে এ শব্দের দ্বারা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অদ্বিতীয় মর্যাদা ব্যক্ত করিয়াছেন, যে মর্যাদার দ্বারা উক্ত আয়াতের প্রথম অংশে বর্ণিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে তাঁহার অপুত্রক হওয়ার আপত্তিকে খণ্ডন করা হইয়াছে। অর্থাৎ দৈহিকভাবে তিনি কোন পুরুষের পিতা না হইলেও তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে পুত্র-সন্তানদের পিতা। অর্থাৎ সকল নবীই তাঁহার সন্তান স্বরূপ—তাঁহার মোহর বা সত্যায়ন এবং আত্মিক প্রভাব ও কল্যাণ বিতরণের ফলশ্রুতিতেই নবী হইয়াছেন। আর কিয়ামতকাল পর্যন্ত তাঁহার এই কল্যাণ বিতরণের অপূর্ব মর্যাদা অম্লান ও সমুজ্জ্বল থাকিবে। কেননা তিনি নবুয়তের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যে পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠতার অধিকারী। উক্ত অর্থে তাঁহার খাতামান-নবীয়ীন হওয়া সর্বকালে সর্বোতভাবে একটি প্রমাণিত সত্য। প্রকৃত পক্ষে 'খাতামান্নাবীয়ীন'-এর বড়ই ব্যাপক অর্থ ও তত্ব আছে যাহার কোন শেষ নাই।

'লা নাবীয়া বা'দী—সহ সকল হাদীসের অর্থ কুরআন শরীফের আলোকেই করিতে হইবে এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং বিভিন্ন হাদীসে ঐগুলির যে স্পষ্ট অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন তদনুযায়ী করিতে হইবে। সুতরাং এ উম্মতের শীর্ষস্থানীয় অবশ্য-মান্য বুজুর্গানে-দ্বীন পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে উক্ত হাদীসে বর্ণিত নবী বলিতে শরীয়তবাহী ও স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী বলিয়া ব্যাখ্যাদান করিয়াছেন। আহ্‌মদী-এর এ সংখ্যায় প্রকাশিত পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে তাঁহাদের গ্রন্থাবলী হইতে এতদসংক্রান্ত উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করা হইয়াছে।

সকল প্রকার নবুয়তের চিরকালীন রুদ্ধতার ধারণাকে পবিত্র কুরআনে একটি প্রাচীন প্রচলিত ধারণা বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং নিম্নে দুইটি আয়াত এ প্রসঙ্গে পেশ করা হইল ঃ

সূরা আল-মুমেনের ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বনী ইস্রাইল তাহাদের জামানায় নবুয়তের ধারাবাহিকতাকে সর্বদা রুদ্ধ করার জন্য উদ্যত থাকিত, এমন কি হযরত ইউসুফ (আঃ)—যিনি কোন পৃথক উম্মতের প্রতিষ্ঠাকারীও ছিলেন না এবং কোন কিছুর খাতামও ছিলেন না—তাঁহার মৃত্যুর পর প্রচার করিতে লাগিল যে তাঁহার পরে আর কোন রসূল আসিবেন না। "হাত্‌তা ইযা হালাকা কুলতুম লাই ইয়াবয়াসা-ল্লাহু মিম বা'দিহি রসুলা ; কাযালিকা ইউযেল্লুল্লাহু মান হুয়া মুসরেফুম-মুরতাব।"

অর্থ—"এমন কি যখন তিনি (ইউসুফ) মৃত্যুবরণ করিলেন তখন তোমরা বলিতে লাগিলে যে, তাহার পরে আর কোন রসূলকে আল্লাহ প্রেরণ করিবেন না। এরূপেই আল্লাহ প্রত্যেক সীমালঙ্ঘণকারী ও সন্দিহান ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন।" (সূরা আল-মুমেন—আয়াত ৩৪)

তেমনিভাবে সূরা জিন্-এর প্রথম রুকুতে প্রকাশ যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর পরেও এক শ্রেণীর মানুষ এই ধারণনার বষবর্তী হইয়াছিল যে, আর কোন রসূল আসিবেন না—তিনিই আখেরী বা শেষ নবী। সুতরাং সূরা জিনে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সকল জিন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওহী শ্রবণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল (ইতিহাসে প্রমাণিত যে তাহারা ছিল নসিবাইন হইতে আগত ইহুদী) তাহারা তাহাদের জাতির নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল ঃ

"আন্নাহুম যান্নু কামা যানানতুম আন লাই ইয়াব্‌য়াসাল্লাহু আহাদা।" (সুরা জিন ঃ ৭)

অর্থাৎ—"যে দেশ হইতে আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি, সেখানকার লোকজনও তোমাদের মতই এ বিশ্বাস পোষণ করিত যে, খোদাতায়ালা ভবিষ্যতে আর কাহাকেও নবী করিয়া পাঠাইবেন না।" সুরা আহকাফের ৪র্থ রুকু হইতে জানা যায় যে, ইহারা হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনয়নকারী ছিল। সুতরাং সুরা জিনের উল্লিখিত আয়াতের সরল অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর পরে কোন নবী আসিবেন না বলিয়া আকীদাও ঐ সকল লোকেরই ছিল।

পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যেও এ প্রকারের ধারণা সাধারণভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর পর খৃষ্টানদের এই আকীদা বদ্ধমূল হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) সশরীরে দ্বিতীয়বার আসিবেন কিন্তু অন্য কোন নবী-রসূল প্রেরিত হইবেন না।

তেমনিভাবে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসের ভিত্তিও একথার উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, বেদের ঋষিগণের উপরই ভগবানের বাণী শেষ হইয়া গিয়াছে, উহাদের পর আর কোন নবী-রসূল আসিবেন না।

মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
সদর মুরুব্বী।

হাদীস শরীফের আলোকে

খতমে নবুয়তের প্রকৃত অর্থ

মানবের সেরা, নবীকুল সম্রাট, দুই জাহানের সরদার হযরত মাহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া উাল্লামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল এই যে আল্লাহতায়ালা স্বীয় পবিত্র কালাম কুরআন মজীদের সুরা আহযাবে তাঁহাকে খাতামান্নাবিয়ীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইরশাদ রহিয়াছে যে, "মোহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য হইতে কাহারো পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রসুল এবং খাতামান্নবিয়ীন (নবীদের মোহর), এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে সর্বজ্ঞাত" (আহযাব ৪১ – আঃ)

এস্থলে খাতামান্নবীয়ীনের ব্যাখ্যা স্বয়ং নবী করীম সাঃ) কি করিয়াছেন তাহা নিয়া আমরা আলোচনা করিব।

উক্ত আয়াত নাযেল হওয়ার পাঁচ বৎসর পরে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পুত্র ইব্রাহীম যখন মারা যান তখন আঁ-হযরত (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছিলেন, "লাও আশা লা-কানা সিদ্দীকান মাবীয়া।" – "ইব্রাহীম জীবিত থাকিলে অবশ্যই সত্য নবী হইতেন।" (ইবনে মা'জা – কিতাবুল জফায়েল)। প্রকাশ থাকে যে, ইবনে মাজা সিহা-সিত্তার অন্তর্গত ; হাদিসটির সত্যতার ও উহার নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার সম্বন্ধে বহু মোহাদ্দেস সাক্ষ্য দান করিয়াছেন। (হযরত হাফেজ ইবনে হাজার আসকালাণীর আসমাউররিজাল সম্বন্ধে সংকলিত কিতাব তাহযীবুত্তাহযীব দ্রষ্টব্য)। এই হাদিসটি 'তারিখ ইবনে আসাকেরে' এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, "লাও আশা ইব্রাহীমু লা-কানা নবীয়্যান।" ইহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পুত্র ইব্রাহীম মারা গিয়াছিলেন ৯ম হিজরীতে, আর আয়াত খাতামান্নাবিয়ীন নাযেল হইয়াছিল ৫ম হিজরীতে। অতএব খাতামান্নাবিয়ীনের অর্থ নবী করীম (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে যদি এই হইত যে তাঁহার পরে কোন প্রকারের নবী কোন দিন হইতে পারিবে না, তাহা হইলে নবী করীম (সাঃ) এইরূপ কখনও বলিতেন না যে ইব্রাহীম জীবিত থাকিলে অবশ্যই সত্য নবী হইত বরং এইরূপ বলিতে পারিতেন যে ইব্রাহীম জীবিত থাকিলেও নবী হইতে পারিত না কারণ আমি খাতামান্নাবিয়ীন – আমি শেষ নবী। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) এইরূপ বলেন নাই। কারণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে খাতামান্নাবিয়ীনের ঐ মর্ম ছিল না যাহা এক শ্রেণীর লোক বিনা প্রমাণে একগুঁয়ে হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় হাদীস এইরূপ আসিয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন "আবু বকরিন আফজালু হাযেহিল উম্মতে ইল্লা আইয়াকুনা নাবিয়্যুন" – "আবু বকর এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদি কোন নবী না হয়।" (কানযুল হাকায়েক ; তিবরাণী ; কানযুল উম্মাল)। স্মরণ রাখা উচিত যে, উক্ত হাদীসে "নাবিয়্যুন" শব্দটি "ইয়াকুনা"র খবররূপে ব্যবহৃত হয়

নাই, 'ইয়াকুনা'র খবর হইলে "নাবিয়্যান" মানসুব অবস্থায় বর্ণিত হইত। অতএব 'নবিয়্যুন' শব্দটি হযরত আবুবকরের জন্য খবররূপে ব্যবহৃত হয় নাই বরং শব্দটি "ইয়াকুনা"র ইসমরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার খবর উহ্য রহিয়াছে। সুতরাং উক্ত হাদিসের অর্থ দাঁড়ায় যে, এই উম্মতে নবী হইতে পারেন এবং এরূপে নবী হইলে তিনি আবুবকর হইতে 'আফযাল' হইবেন।

তৃতীয় হাদীস হইল এই—"তাকুনোন নবুওয়াতু ফিকুম মাশাআল্লাহ্ সুম্মা তাকুনো খেলাফাতুন আলা মিনহাজেন নবুওয়তে মাশাআল্লাহ্ সুম্মা তাকুনো মুল্কান্ আষ্যান্ ফাতাকুনো মাশাআল্লাহ্ সুম্মা তাকুনো খেলাফাতোন আলা মিনহাজেন্নাবুওয়াতে।" অর্থ—"তোমাদের মধ্যে নবুয়ত বর্তমান থাকিবে যতদিন আল্লাহ্ চাহিবেন, তাহার পর নবুয়তের নিয়মে খেলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ চাহিবেন; অতঃপর নবুয়তের নিয়মে পুনরায় খেলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।" (মিশকাত, কিতাবুল ফিতন, ৪৬১ পৃঃ)।

এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে শেষযুগে পুনরায় নবুয়তের নিয়মে খেলাফত কায়েম হইবে এবং (উহা তোমাদের মধ্যে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কায়েম থাকিবে। ইহার পূর্ববর্তী উত্থান-পতন সম্বন্ধে নির্দিষ্টকাল বুঝাইবার জন্য "মাশাআল্লাহ" শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু শেষ যুগের উত্থানের পর মাশাআল্লাহ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় নাই; যাহাতে বুঝা যায় যে, উহা সীমাহীনকাল পর্যন্ত কায়েম থাকিবে।) ইহা এইরূপেই কায়েম হইবে যেরূপে ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর খেলাফত কায়েম হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা গেল যে শেষযুগেও নবী আবির্ভূত হইবেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর নবুয়তের নিয়মে খেলাফত কায়েম হইবে।

এ স্থলে অবশ্যই প্রশ্ন জাগে যে হাদীসে আসিয়াছে, "লা বীয়া বা'দী"—'আমার পরে কোন নবী নাই'; ইহার কি মর্ম হইতে পারে? উত্তরে প্রকাশ থাকে যে যেরূপ আল্লাহর কালাম কুরআন করীমের আয়াতসমূহে পরস্পর কোন বৈরূপ্য নাই তদ্রূপ তাঁহার প্রিয়তম নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কালামের মধ্যেও পরস্পর কোন বৈরূপ্য নাই। যদি কোথাও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কালামের মধ্যে বাহ্যতঃ কোন বৈরূপ্য পরিলক্ষিত হয়, তখন কুরআন করীমের আলোকে সেই বৈরূপ্য দূর করিয়া পরস্পর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিতে হইবে। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুকরণে ও অনুসরণে উম্মতি নবী হইতে পারে; স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অন্য কতিপয় হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে উম্মতে নবী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় বুঝিয়া লইতে হইবে যে নিশ্চয়ই হাদীস "লা নবিয়া বাদীর" অন্য কোন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মর্ম আছে। প্রসঙ্গক্রমে ইহা স্মরণ রাখা উচিত "বা'দ" শব্দটির অর্থ কেবল "মৃত্যুর পরই" বুঝায় না বরং "ছাড়া, ব্যতিরেকে ও বিপরীত' অর্থও বুঝায়; যেমন আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, "ফাবে আইয়্যে হাদীসেন বা'দাল্লাহে ওয়া আয়াতেহী ইউমেনুন" (জাসিয়া)—"আল্লাহ ও তাঁহার আয়াতের পর তাহারা আর কোন কথার উপর ঈমান আনিবে?" এস্থলে "বা'দ" শব্দটি "মৃত্যুর পর" বুঝাইতেছে না।

এবং 'বিপরীত' বলিয়া অর্থ বুঝাইতেছে। সুতরাং "লা বাবীয়া নাদী"র মধ্যেও "বা'দ" উক্ত অর্থেই গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ) এর শরীয়ত ছাড়িয়া তাঁহার বিপরীত ও মুকাবেলায় কোন নবী আসিবে না। এই মর্মের সমর্থনে এই হাদীসটি উল্লেখযোগ্য—আঁ-হযরত (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, "ইন্নি আখেরুল আম্বিয়ায়ে ওয়া মাসজিদি হাযা আখেরুল মাসাজেদে" (মুসলিম)। আমি নবীদের মধ্যে শেষ নবী এবং আমার এই মসজিদটি সকল মসজিদের মধ্যে শেষ মসজিদ। এই হাদীস দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া গেল। আঁ-হযরত (সাঃ) "শেষ নবীর" অর্থ "শরীয়তের দিক দিয়া শেষ নবী; এখন যে নবী আসিবে সে ঐরূপেই আমার শরীয়তের অনুসরণ পূর্বক যিল্লি নবী হইবে যেরূপ আমার মসজিদের অনুসরণে যিল্ল বা প্রতিচ্ছায়ারূপে অন্যান্য মসজিদ নির্মিত হইবে।

উম্মতের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ইমাম এবং হাক্কানী আলেমবৃন্দও "লা নাবীয়া বা'দী'র উক্ত মর্মই গ্রহণ করিয়াছেন। (এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত উদ্ধৃতি সমূহ 'আহমদী'-এর অত্র সংখ্যায় প্রকাশিত পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—সম্পাদক)।

এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে পবিত্র কুরআনে খাতাম' শব্দটি "তা" অক্ষরে যবর সহ আসিয়াছে যাহার অর্থ 'শেষ করা' কখনও হয় না বরং উহা দ্বারা মোহর বুঝায় যাহা তশদীক ও সমর্থনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন 'খাতাম' শব্দটি বহুবচনের প্রতি মুযাআফ (সমন্ধযুক্ত) করা হয় তখন উহা 'আফজল, শ্রেষ্ঠ ও মহান'-এর মর্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহাতে কোন ব্যাতিক্রম নাই, যথা—খাতামুল আম্বিয়া, খাতামুল আউলিয়া, খাতামুল মুহাজেরীন, খাতামুল উলামা প্রভৃতি।

হযরত নবী করিম (সাঃ) হযরত আলীকে এরশাদ করিয়াছেন, "কামা আনা খাতামুল আম্বিয়া আনতা ইয়া আলীইউ খাতামুল আউলিয়া"—'হে আলী! যেরূপে আমি নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী তদ্রুপ তুমি ওলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ওলী।' (তফসীর সাফী)।

মোট কথা, খাতামান্নবীয়ীনের অর্থ শেষ নবী, আর তাঁহার পরে কোন নবী নাই, এই অর্থকে অভিধানও গ্রহণ করে না, আঁ-হযরত (সাঃ)ও গ্রহণ করেন না, পবিত্র কুরআনও তাহা গ্রহণ করে না, তাহাছাড়া সাহাবা এবং পরবর্তী আয়েম্মা কারামও উহা গ্রহণ করেন নাই।

এই উম্মতে শেষযুগে প্রতিশ্রুত ঈসা ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সম্বন্ধে হাদিসে বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। মুসলিম শরীফের 'বাব যিকরেদ দজ্জালে' বর্ণিত হাদিসে হযরত নবী করীম (সাঃ) আগমনকারী ঈসা (আঃ)-কে চারবার 'নবীউল্লাহ'—'আল্লাহর নবী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, 'লা নাবীয়া বাদী" ও খাতামান নবীয়ীনের অর্থ ইহা নয় যে, তাঁহার পর কোন নবী নাই।

—মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক,
সদর মুরুব্বী।

শীর্ষস্থানীয় সর্বজন-স্বীকৃত বুজুর্গানে-উম্মতের দৃষ্টিতে
খতমে-নবুয়ত সংক্রান্ত সর্বসম্মত অকীদা বা অভিমত

(১)

ধর্মের অর্ধাংশের শিক্ষয়ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উক্তি সর্ব প্রথমে উপস্থিত করিতেছি। তিনি বলেনঃ—

"তোমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লামকে 'খাতামুল আম্বিয়া' বলিবে; 'তাঁহার পর কোন নবী নাই'—একথা বলিও না।"

(তাক্‌মেলা-মজমাউল বেহার, পৃঃ ৮৫, তফসীর আল-দুররুল মানসুর ৫ম খণ্ড পৃঃ ২০৪)

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত উম্মুল মুমেমীন আয়েশা (রাযিঃ) 'খাতামুন-নাবীয়ীন' বলিতে অধুনা উলামা কৃত অর্থ শুধু 'শেষ নবী' বলিয়া মনে করিতেন না, বরং এই অর্থ গ্রহণ করিতে এবং ইহাকে প্রচার করিতে সমগ্র উম্মতকে নিষেধ করিয়াছেন।

(২)

ইমাম মুহাম্মদ তাহের (রহঃ) উল্লিখিত উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর এই উক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদিস "লা-নাবীয়া বাদী" এর বিরোধী নয়। তিনি বলেন :

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, এমন কোন নবী হইবেন না যিনি তাঁহার শরীয়তকে রহিত করিবেন।" ('তাকমেলা মাজমাউল-বেহার, ৮৫ পৃঃ)

(৩)

হযরত ইমাম আলী কারী (রহঃ) বলেন :

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পর এমন কোন নবী আসিতে পারেন না যিনি তাঁহার শরীয়ত রহিত করিবেন এবং তাঁহার উম্মত হইতে হইবেন না।" (মওযুয়াতে কবীর)

(৪)

সুফী-কুল-শিরোমণি হযরত শাইখে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী (রহঃ) লিখিয়াছেন :—

(ক) "রসুল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনে যে নবুয়ত বন্ধ হইয়াছে তাহা শুধু শরীয়ত আনয়নকারী (তশরিয়ী) নবুয়ত; নবুয়তের মোকাম নহে। সুতরাং এমন কোন শরীয়ত আসিবে না, যাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীয়তকে রহিত করিবে কিংবা তাঁহার শরীয়তে কোন আদেশ বৃদ্ধি করিবে। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিম্ন-লিখিত উক্তি উপরোক্ত অর্থই বহন করে :

"ইন্নার রেসালাতা ওয়ান্নাবুয়াতা কাদ ইনকাতায়াত ফালা রসুলা বা'দী ওয়ালা নবীয়া"— "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই হাদিসের অর্থ এই যে, ভবিষ্যতে এমন কোন নবী হইতে পারেন না, যিনি আমার শরীয়তের বিরোধী হইবেন, বরং যখনই কোন নবী হইবেন, তিনি আমার অধীনে হইবেন।" ('ফাতুহাতে-মক্কিয়া, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩)

(খ) "সুতরাং নবুয়ত সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায় নাই। এজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, তশরিয়ী নবুয়ত উঠিয়া গিয়াছে, এবং ইহাই হাদিসের অর্থ।" (ফাতুহাতে-মক্কিয়া ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৪)

(গ) তাঁহার মতে খাতামুন-নাবীয়ীন-এর অর্থও 'শেষ শরীয়ত-দাতা নবী।' যেমন, তিনি বলেন :—

"আরম্ভ এবং শেষ করিবার বিষয়াবলীর মধ্যে শরীয়তের অবতরণ অন্যতম। আল্লাহ্-তায়ালা শরীয়ত অবতরণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের শরীয়ত দ্বারা শেষ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি 'খাতামুন নবীয়ীন'।" ('ফাতুহাতে-মক্কিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫-৫৬)

(ঘ) অতঃপর, শইখে আকবর (আলাইহির রহমত) 'নবুয়তে মুতলাকা' অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্যে সাধারণ নবুয়তের পদ জারী থাকা সম্বন্ধে বলেন :

"কোন সন্দেহ নাই, 'নবুয়াতে মুতলাকা' কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সৃষ্টির মধ্যে জারী থাকিবে, যদিও নুতন শরীয়ত আনয়ন বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং শরীয়ত আনায়ন নবুয়তের অংশগুলির মধ্যে একটি অংশ বটে।' ('ফাতুহাতে-মক্কিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০)

৫

ইযরত পীরানে-পীর সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (কুদ্দেসা সিররুহু) বলেন :

"নিশ্চয় আল্লাহ-তায়ালা আমাদিগকে গোপনে তাঁহার বাক্য এবং রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং এইরূপ মর্যাদাবান পুরুষদিগকে "আম্বিয়াউল আওলিয়া" বলা হয়।" (আল-ইওয়াকিতু ওয়া আল-জাওয়াহের ; নেবরাস)

(৬)

বুজুর্গানে-দ্বীন যে নবুয়ত আওলিয়াগণের মধ্যে অব্যহত থাকা বিশ্বাস করেন তাহা 'নিছক 'বিলায়েত' (শুধু অলি হওয়া') অপেক্ষা উচ্চতর। সুতরাং এই মোকামের শান সম্বন্ধে "আরিফে রব্বানী" হযরত আব্দুল করীম জীলানী (আলাইহের রহমত) বলেন :

'রুহানী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রত্যেক নবুয়ত অলীর বেলায়েত হইতে শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই বলা হয় যে, 'ওলির চরম পরিণতি নবুয়তের প্রথম ধাপ'। সুতরাং এই সুক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করুন এবং ভাবিয়া দেখুন যে, কিরূপে ইহা আমাদের স্বধর্মীয়দের মধ্যে তাহাদের অনেকের নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।" অর্থাৎ তাঁহারা নবুয়তুল বেলায়েতকে নিছক বেলায়েতের একটা পর্যায় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন,—ইহা ঠিক নয়। (আল-ইনসানুল কামেল, পৃঃ ৮৫)

অতঃপর আরিফে রব্বানী আরও লিখিয়াছেন :

"অনেক নবীর নবুয়তও 'অলিগণের নবুয়তের' ন্যায় নবুয়তুল-বেলায়েত, যেমন খিজার আলাইহেস সালামের নবুয়ত এবং হযরত ঈসা আলাইহেস সালামের নবুয়ত, এবং যখন তিনি

পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন, তখন তাঁহার নবুয়ত 'তশরীয়ী' (শরীয়তবাহী) হইবে না। বনি-ইস্রায়ীলের অন্যান্য নবীগণেরও একই অবস্থা।" (অর্থাৎ, তাহাদের নবুয়ত 'নবুয়াতুল-বেলায়েত' ছিল, তথা তশরীয়ী নবুয়ত ছিল না)। (আল-ইনসানুল-কামেল)

এই যে নবুয়াতুল-বেলায়েত সহ প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র আগমন হইবে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, শেখ আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল-আরাবী ইহাকে 'নবুয়াতে মুৎলাকা বা সাধারণ নবুয়াত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

"হযরত ঈসা (আলাইহেস সালাম) 'নবুয়াতে মুৎলাকার অধিকারী অলি' স্বরূপ অবতরণ করিবেন।" (ফতুহাতে-মক্কিয়া)। তিনি আরো বলিয়াছেন :—

"হযরত ঈসা আলাইহেস সালাম আমাদের মধ্যে 'হাকাম'—মীমাংসাকারীরূপে শরীয়ত ব্যতিরেকে অবতরণ করিবেন এবং কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি নবী হইবেন।"

(ফাতুহাতে-মক্কিয়া)

(৭)

আহলে হাদিসের শীর্ষ স্থানীয় আলমে নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালবী লিখিয়াছেন :

"যে ব্যক্তি এই আকিদা রাখিবে যে, হযরত মসিহ্‌ (আঃ) নবুয়ত বিচ্যুত হইয়া (তথা শুধুমাত্র উম্মতী হইয়া) আসিবেন, সে খোলাখুলি কাফের। যেমন ইমাম সুউতী এই সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়াছেন।' (হেজজুল-কেরামা, পৃঃ৪৩১)

(৮)

হযরত ইমাম আব্দুল অহ্‌হাব শা'রানী (আলাইহির রহমত) লিখিয়াছেন :—

"সুতরাং, কোন সন্দেহ নাই যে, শুধু সাধারণ নবুয়ত (নবুয়তে মুৎলাকা) উঠিয়া যায় নাই—কেবলমাত্র শরীয়তবাহী (তশরীয়ী) নবুয়াত বন্ধ হইয়াছে।" ['আল-ইউওয়াকিতু ও আল-জওয়াহের, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫]। তিনি আরও বলিয়াছেন :

"রসুল করীম সাল্লাল্লাহু ও সাল্লামের হাদিস—"আমার বাদ নবী বা রসুল নাই"—দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, তাঁহার পর 'শরীয়তদাতা' কোন নবী নাই।" (ঐ)

(৯)

আরেফে রব্বানী সৈয়দ আবদুল করিম জিলানী (আলাইহের রহমত) বলেন :—

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর 'শরীয়ত-বাহী (তশরীয়ী) নবুয়ত বন্ধ হইয়াছে এবং এই হিসাবে মোহাম্মদ (সাঃ) খাতামুন-নাবীয়ীন, কেননা তিনি পূর্ণ শরীয়ত সহকারে আসিয়াছেন এবং এই ভাবে পূর্ণ শরীয়ত সহকারে আর কেহই আগমন করেন নাই।"

(আল-ইনসানুল কামেল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮ মিশরে মুদ্রিত)

(১০)

সুবিখ্যাত সুফি হযরত মৌলানা রুমি (আলাইহের রহমত) লিখিয়াছেন :—

"খোদার পথে পূণ্যার্জনের এমন চেষ্টা কর, যেন উম্মতের মধ্যে নবুয়তের অধিকারী হইতে পার।" (মসনবী)

(১১)

হযরত সৈয়দ অলিউল্লাহ্ শাহ্ মুহাদ্দেস দেহলবী (আলাইহের রহমত) বলেন :

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বারা নবুয়ত খতম হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার পর এমন কোন নবী আগমন করিবেন না, যাঁহাকে খোদাতায়ালা শরীয়ত দিয়া লোকের প্রতি মামুর (আদিষ্ট) করিবেন।" (তফহীমাতে ইলাহীয়া, পৃঃ ৫৩)

(১২)

হযরত মৌলবী আবদুল হাই লক্ষৌবি ফিরিঙ্গি-মহল্লী বলেন :—

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর, কিংবা তাঁহার সময়ে কাহারো শুধু নবী হওয়া অসম্ভব নহে। পরন্তু নুতন শরীয়ত-ধারী নবীর আগমন অসম্ভব।"

(দাফে-উল-ওস্ওয়াস্ পৃঃ ১২)

(১৩)

আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব বলেন :

"আমার মৃত্যুর পর কোন অহী নাই"—হাদীসের কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য "আমার পরে কোন নবী নাই," বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানীদের নিকট ইহার অর্থ এই যে, "আমার পর শরীয়ত রহিত-কারী কোন নবী আসিবেন না।" (একতেরাবুস্-সা'আ, পৃঃ ১৬১)

(১৪)

হযরত মৌলানা মোহাম্মদ কাশেম নানতবী (রহঃ), দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা বলেন :—

"সর্ব সাধারণের ধারণানুসারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'খাতামুন নাবীয়ীন' হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁহার যুগ সকল নবীর পরে এবং তিনি সকল নবীর শেষ। কিন্তু সূক্ষ্ম-দর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট ইহা দেদীপ্যমান সত্য যে, সময়ের অগ্র-পাশ্চাতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সুতরাং, প্রশংসা-স্থলে "ও লাকিররাসুলুল্লাহে ও খাতামান-নাবীয়ীন" (কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসুল ও খাতামান-নাবীয়ীন) বলা কি ভাবে যথার্থ হইতে পারে ?" (তহ্যিরুন-নাস, পৃঃ ৩)

অন্য কথায়, 'খাতামান নাবীয়ীন'-এর অর্থ 'শুধু শেষ নবী' করা তাঁহার মতে সাধারণ লোকের কৃত অর্থ এবং ইহা বিচারশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কৃত অর্থ নয়।

অতঃপর, তিনি 'খাতামান-নাবীয়ীন'-এর অর্থ করিয়াছেন :—

"আঁ-হযরত (সাঃ) নবুয়তের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য নবীগণ নবুয়তের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন না। অন্যান্যগণের নবুয়ত তাঁহার কল্যাণে প্রসূত, কিন্তু তাঁহার নবুয়ত অন্যের কল্যাণে নয়। এই প্রকারে তাঁহার উপরে নবুয়তের

সেলসেলা মোহরাবদ্ধ হইয়া যায়। বস্তুতঃ তিনি যেমন আল্লাহর নবী, তেমনি নবীগণেরও নবী।" (তহ্‌যিরুন-নাস, পৃঃ ৩-৪)। তিনি আরও বলেন ঃ

"বস্তুতঃ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরেও যদি কোন নবী পয়দা হন, তথাপি মুহাম্মদী খাতেমিয়তে কোনই পার্থক্য ঘটিবে না।" (তহ্‌যিরুন-নাস, পৃঃ ২৮)

(মৌলানা কাজী মোহাম্মদ নজীর প্রণীত 'খতমে নবুয়ত' পুস্তক হইতে সংকলিত)

এই হইল সর্ব জন-মান্য বুজুর্গানের উক্তি, যাঁহারা ধর্ম-জ্ঞান, বিচার-ক্ষমতা এবং ঐশী প্রেমে মগ্ন হওয়ার দিক দিয়া এত উচ্চ ও মহান যে সকল মুমেন-মুসলমানই তাঁহাদের পাদুকা বহনেও গৌরবানুভব করিবেন। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগণের যুগ সাহাবাগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। হেজায, সিরিয়া, তুর্কি, এরাক, স্পেন এবং ভারতবর্ষের ইহারা সুপ্রসিদ্ধ বুজুর্গ।

এই বুজুর্গাণ 'খাতামু-নাবীয়ীন' আয়াতের এবং 'লা-নাবীয়া বাদী' প্রভৃতি হাদিস দ্বারা যে প্রকার নবুয়ত বন্ধ হইয়াছে তাহার এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর কোন শরীয়তদাতা ও স্বাধীন নবী আসিতে পারেন না। তাঁহাদের মতে, 'উম্মতি-নবীর' আগমন 'খতমে নবুয়তের' বিরোধী নয়। সুতরাং, তাঁহারা সকলেই এই উম্মতে আগমনকারী মহিহ্ মওউদকে 'উম্মতি নবী' বলিয়া স্বীকার করেন।

অতঃপর, আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা—হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী হইতে খতমে-নবুয়ত সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও আকীদা সংক্রান্ত কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা যাইতেছে। উভয় বর্ণিত উদ্ধৃতি সমূহ পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে প্রত্যেকেই স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, আহামদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা খতমে-নবুয়ত সম্পর্কে অবিকল তাহাই বলিয়াছেন যাহা পূর্ববর্তী অবশ্য-মান্য ইমামগণ ও শীর্ষস্থানীয় আলেমবৃন্দ বলিয়া আসিয়াছেন এবং নবুয়ত সংক্রান্ত কোন নুতন আকীদা বা মতবাদ তিনি বা আহমদীয়া জামাত পোষন করেন নাই, বরং বুজুর্গানে-উম্মত কর্তৃক ব্যক্ত আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত নুতন আকীদা বা মতবাদ রচনা করিয়াছেন আহমদীয়া জামাত বিরোধী অধুনা আলেমবৃন্দ। আশ্চর্যের বিষয়, তাহা প্রচার করিয়া তাঁহারা আহমদীয়া জামাতকে খতমে-নবুয়তের অস্বীকারকারী এবং কাফের বলিয়া ফতোয়া ও জারী করিতেছেন।

এ জামানার উলামা খাতামান-নবীয়ীন বা খতমে নবুয়তের অর্থ করিয়াছেন 'নবুয়তের সম্যক অবসান বা নবীদের অবসানকারী—রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর কোন প্রকারের নবী আসিতে পারেন না, এমনকি কুরআন করীমের অধীন এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কল্যাণ প্রাপ্ত দাস হিসাবেও না। অধুনা আলেমগণ দাবী করেন যে, খতমে নবুয়ত সংক্রান্ত তাহাদের এই মতবাদই ইসলামী আকীদা। উপরে উদ্ধৃত বুজুর্গনে উম্মতের ব্যাখ্যা ও সর্বসম্মত আকীদা ইসলামী আকীদা, না উলেমার উক্ত দাবী সত্য—তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রত্যেক মুমেন-মুসলমানের কর্তব্য।

—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
সদর মুরুব্বী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দৃষ্টিতে
খতমে-নবুয়তের তাৎপর্য

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেন ঃ

"মানবজাতির জন্য জগতে আজ কোরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম-সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসুল এবং শাফী (যোজক) নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার।

"অন্য কোন মানবকেই খোদাতায়ালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন। তাঁহাকে জীবিত রাখিবার জন্য খোদাতায়ালা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাঁহার শরীয়ত (পবিত্র কুরআন এবং তাঁহার রুহানিয়াতকে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণবর্ষী করিয়াছেন।

"ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতায়ালা তোমাদের নিকট ইহাই চাহেন, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ এক এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামুল-আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। তিনি সকল নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসিবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হইতে কখনও পৃথক নহে।" (কিশতিয়ে নুহ্ পৃঃ ২৫ ও ২৯)

"কোরআন শরীফ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) খাতামান নবীয়ীন কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে খাতামান-নাবীয়ীন হিসাবে সাব্যস্ত করিতেছেন। কেননা তাঁহারা বলেন যে, সহি মুসলিম প্রমুখ হাদিস গ্রন্থাদিতে যেখানে আগমনকারী মসিহকে নবীউল্লাহ্ (আল্লাহর নবী) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সেখানে হাকিকী (অর্থাৎ স্বাধীনসূত্রে প্রাপ্ত স্বতন্ত্র) নবুয়তকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। এখন ইহা অতি স্পষ্ট যে, যখন তিনি আপন নবুয়ত সহকারে দুনিয়াতে আগমন করিবেন, তখন আমাদের নবী (সাঃ) কিরূপে খাতামান-নবীয়ীন থাকিতে পারেন ?"

[কিতাবুল বারিয়া, পৃঃ ১৯০১, ১৮৯৮ইং সনে প্রকাশিত]

'ঠিক সেই ভাবে কোন নূতন বা পুরাতন নবী নিশ্চয়ই আসিতে পারেন ন, যে ভাবে আপনারা মনে করেন যে, শেষ যুগে ঈসা (আঃ) নামিয়া আসিবেন তখন তিনি নবী থাকিবেন, চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রতি নবুয়তের অহি হইতে থাকিবে এবং তাঁহার দ্বিতীয় নবুয়তকাল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুয়ত-কাল হইতেও দীর্ঘতর হইবে ; এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করা নিশ্চয় পাপ। আমরা ইহার ঘোর বিরোধী। কোরআনের আয়াত – "ওয়া লাকিন রসুলাল্লাহে ও খাতামান-নবীয়ীন" – 'তিনি ত আল্লাহ্‌র রসুল এবং খাতামান-

নবীয়ীন' এবং হাদীস—'লা নাবীয়া বাদী' উক্ত আকিদাকে সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছে। উক্ত আয়াতের উপর আমরা পূর্ণ এবং সত্যিকার বিশ্বাস রাখি।" (এক গালাতি কা ইযালা,)

"আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়াতে জানাইয়াছেন, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে এবং ইহা সম্ভব নহে যে তাঁহার পরে কোন হিন্দু, ইহুদী, খ্রীষ্টান বা কোন নামধারী মুসলমান নিজেকে নবী বলিয়া সাব্যস্ত করে। নবুয়তের সকল পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু একটি পথ সীরাতে-সিদ্দিকির খোলা আছে, যাহাকে 'ফানা-ফির-রসুল' (রসুলের প্রেম ও অনুগমনে সম্পূর্ণ আত্ম-বিলীন) বলে। সুতরাং এই পথ দিয়া যেরূপে মোহাম্মাদী নবুওয়াতের ভূষনে ভূষিত করা হয়, সেরূপে যিনি নবী হন, তিনি আক্রোশের পাত্র নহেন। ইহা তাঁহার স্বকীয় স্বতন্ত্র নবুয়ত নহে, পরন্তু তিনি ইহা তাঁহার নবীর উৎস হইতে গ্রহণ করেন, এবং নিজ গৌরবের জন্য নহে, বরং তাঁহার নবীর গৌরব প্রকাশের জন্য। ... ... সুতরাং ইহাতে খাতামান-নবীয়ীনের অর্থে কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না। পক্ষান্তরে ঈসা (আঃ) আবার এই পৃথিবীতে আসিলে খাতামান-নবীয়ীনের অর্থে নিশ্চয় ব্যতিক্রম ঘটিবে।" (এক গালাতি কা ইযালা

"যাহার উপর আল্লাহর নিকট হইতে গায়েবের সংবাদ প্রকাশিত হইবে, "লা ইউজহেরু আলা গাইবিহি আহাদান'—আয়াত অনুসারে তাহার উপর নবী শব্দের মর্ম প্রযুক্ত হইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা প্রেরিত হইবে, তাহাকে আমরা রসুল (প্রেরিত) বলিব। অবশ্য আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত নুতন শরীয়ত সহ কোন নবী বা রসুল আসিবে না, অথবা এরূপ কোন ব্যক্তি নবী নাম লাভের অধিকারী হইবেন না, যিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ না করেন এবং এমন ফানা-ফির-রসুল অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে বিলীন হইয়া না যান, যাহার ফলে আকাশে তাঁহার নাম (বুরুজীভাবে) মোহাম্মদ ও আহমদ রাখা হয়। "ওয়া মানেদ্-দায়া ফাকাদ কাফারা [এবং যে এরূপে (স্বতন্ত্রভাবে) দাবী করে, সে নিশ্চয় কাফের]। ইহার মধ্যে আসল তত্ত্ব এই যে, খাতামান-নবীয়ীন শব্দের মর্মানুযায়ী স্বাতন্ত্রের লেশমাত্র বাকী থাকিতে কোন ব্যক্তি নবুয়তের দাবী করিলে, সে খাতামান-নবীয়ীনের উপরস্থ মোহর ভঙ্গকারী হইবে।" (এক গালাতি কা ইযালা)

"প্রত্যক্ষভাবে নবুয়তপ্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং মানিতে হয় যে, আল্লাহর এই দান পাইবার জন্য একমাত্র বুরুজ, যিল্ল বা ফানা-ফির-রসুলের পথ খোলা আছে। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করুন।" (এক গালাতি কা ইযালা)

"ইহার (নবুয়তের) অর্থ আল্লাহর নিকট হইতে জানিয়া গয়েবের সংবাদ দেওয়া। নবীর জন্য শরীয়ত-দাতা হওয়ার শর্ত নাই। নবুয়ত আল্লাহর অপার্থিব দান। ইহা দ্বারা গয়েবের সংবাদ ব্যক্ত হয়।" (এক গালাতি কা ইযালা)

"আমি শরীয়তদাতা নবী নহি এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবীও নহি। কিন্তু আমি আমার নেতা ও প্রভু রসুল (সাঃ)-এর 'ফয়য' (আত্মিক কল্যাণ) লাভ করিয়া এবং তাঁহাতে আত্মবিলিনতায় তাঁহারই নামে আখ্যায়িত হইয়া তাঁহারই মাধ্যমে খোদা হইতে আমি গায়েবের (অজ্ঞেয়

বিষয়াবলীর) জ্ঞান পাইয়াছি। .....এইরূপে নবী হওয়া আমি কখনও অস্বীকার করি নাই। পরন্তু এই অর্থেই আল্লাহ আমাকে নবী ও রসুল বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।"

(এক গালাতি কা এযালা)

"হ্যাঁ, একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং কখনও ভুলিলে চলিবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসুল নামে আখ্যায়িত হইয়াছি, তথাপি খোদাতায়ালার তরফ হইতে আমাকে জানান হইয়াছে যে, আমার প্রতি তাঁহার এই করুণা সাক্ষাৎভাবে হয় নাই, পরন্তু আকাশে এক পবিত্র পুরুষ আছেন, যাঁহার আত্মিক শক্তি আমাতে ক্রিয়াশীল হইয়াছে। তাঁহার নাম মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।" (এক গলাতি কা এযালা)

"পূর্ববর্তী সকল নবী ও সকল ধর্ম-গ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ ইহাদের সকলেরই উপর মোহাম্মদীয় নবুয়ত পরিব্যাপ্ত এবং সকলকেই পরিবেষ্টন করে। এতদ্ব্যতীত অন্য সকল পথই বন্ধ। খোদা পর্যন্ত উপনীত করে, এমন সকল সত্যই ইহাতে নিহিত আছে। অতঃপর কোন নুতন সত্য আসিবে না এবং ইতিপূর্বে এমন কোন সত্য ছিল না, যাহা ইহাতে নাই। এই নিমিত্ত এই নবুয়তের মধ্যে সকল নবুয়ত শেষ হইয়াছে। ইহাই হওয়ার ছিল। কারণ যাহার আদি আছে তাহার অন্তও আছে ; কিন্তু এই মাহাম্মদীয় নবুয়ত স্বীয় আশিস বিতরণে অসমর্থ নয় বরং সকল নবুয়ত অপেক্ষা ইহাতে অধিক ফয়েজ বা আশিস আছে। এই নবুয়তের অনুসরণ অতি সহজে খোদা পর্যন্ত উপনীত করে। ইহার অনুবর্তিতায় খোদাতায়ালার প্রেম ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ স্বরূপ মহাকল্যাণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ইহার পূর্ণ অনুবর্তী কেবল নবী নামে অভিহিত হইতে পারেন না, কারণ ইহাতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মোহাম্মদী নবুয়তের অবমাননা হয়। অবশ্য উম্মতি এবং নবী এই উভয় শব্দ সম্মিলিতভাবে তৎপ্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ, ইহাতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মোহাম্মদী নবুয়তের কোন অবমাননা হয় না; বরং সেই নবুয়তের জ্যোতিঃ এই আশিস-বিতরণ দ্বারা আরো উজ্জলরূপে প্রকাশিত হয়।" [আল-অসিয়ত]

"নবুয়তের দাবীতে ইহা বুঝায় না যে, আমি (নাউযুবিল্লাহ) আঁ-হযরত (সাল্লাল্ল আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হইয়া কোন দাবী পেশ করিতেছি, অথবা কোন নতুন শরীরত আনয়ন করিয়াছি। বরং আমার নবুয়ত শুধু অজ্ঞেয় বিষয়াবলী ও ভবিষ্যৎ সংবাদাদী অধ্যয়িত ঐশী-বাণী ও ঐশী-বাক্যালাপের অধিক্যকে বুঝায়, যাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণে হাসিল হয়। সুতরাং আল্লাহর সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভ (মোকালামা-মোখাতাবা) আপনারাও মানেন। সুতরাং ইহা শব্দগত মতভেদ—অর্থাৎ আপনারা যে বিষয়ের নাম 'মোকালামা-মোখাতাবা' রাখেন, আমি তাহার অধিক্যের নাম আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নবুয়ত রাখি। "ওয়া-লে-কুল্লেন আই ইয়াস্‌তালেহা।" ('এবং নিজের উদ্দেশ্যকে বুঝাইবার জন্য পরিভাষা (ইস্তেলাহ) প্রয়োগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে')। (তাতিম্মা, হাকিকাতুল-ওয়াহী, পৃঃ ৭৮)

"নতুন শরীয়ত, নুতন দাবী এবং নতুন নাম হিসাবে আমি নবী ও রসুল নহি।

আমি নবী ও রসুল, অর্থাৎ কামিল যিল্লিয়ত (ছায়া রূপ) পূর্ণ অনুগমণ ক্রমে আমি সেই দর্পন স্বরূপ, যাহার মধ্যে মোহাম্মদী (আত্মিক) রূপ এবং মোহাম্মীয় নবুয়তের (কাল-মালাতের) পূর্ণ প্রতিবিম্বণ ঘটিয়াছে।" (নুযুলুল মসিহ্, পৃঃ—৩)।

"আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, এই আরবী নবী যাঁহার পবিত্র নাম মোহাম্মদ (হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁহার উপর) তিনি কি উচ্চ মর্যদার নবী! তাঁহার সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নহে, এবং তাঁহার প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতার অনুমান করাও মানুষের কাজ নহে। *

* আশ্চার্যের বিষয় যে, দুনিয়া নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে কিন্তু এই কামেল নবীর কল্যাণ-প্রযাহের কিরণসমূহ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। যদি খোদার কালাম কুরআন শরীফ প্রতিবন্ধক না হইত, তাহা হইলে একমাত্র এই নবীর সম্বন্ধেই আমরা বলিতে পারিতাম যে, তিনি এখনও সশরীরে আকাশে জীবিতাবস্থায় বিদ্যমান আছেন। কেননা আমরা তাঁহার জীবনের প্রকাশ্য চিহ্নাবলী বিদ্যমান পাইতেছি—তাঁহার দ্বীন জীবন্ত দ্বীন—তাঁহার অনুগামী সঞ্জীবিত হয় এবং তাঁহার সাধ্যমেই জিন্দা খোদাকে পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, খোদাতায়ালা তাঁহাকে ও তাঁহার ধর্মকে এবং তাঁহার প্রেমিকগণকে ভালবাসেন। স্মর্তব্য যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবিত এবং আসমানে সবচাইতে তাঁহার মোকাম সর্বোচ্চে অবস্থিত। কিন্তু ইহা নশ্বর পার্থিব দেহ নহে বরং অন্য এক নুরানী (আলোকময়) দেহের সহিত, যাহা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী, তিনি তাঁহার সর্বশক্তিমান খোদার সান্নিধ্যে আসমানে অবস্থিত আছেন।

পরিতাপের বিষয়, সনাক্ত করার যে যথাযথ কর্তব্য ছিল সেইরূপে তাঁহার মর্যাদা ও মর্তাবাকে সনাক্ত করা হয় নাই। যে তৌহিদ জগৎ হইতে লোপ পাইয়াছিল, একমাত্র সেই শক্তিধর মহাবীরই পুনরায় জগতে তাহা আনয়ন করেন। তিনি খোদাতায়ালার সহিত চরম ও পরম পর্যায়ে মহব্বত করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবজাতির সহানুভূতিতে তাঁহার আত্মা বিগলিত হয়। সেইজন্য খোদাতায়ালা যিনি তাঁহার অন্তরের গোপন রহস্য জানিতেন তিনি তাঁহাকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, এবং তাঁহার সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে সফলতা প্রদান করিয়াছেন। সকল ফয়েজ ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই। এবং যে ব্যক্তি তাঁহার কল্যাণদাণ ব্যতিরেকে কোনও মর্যাদা ও ফজিলত লাভের দাবী করে, সে মানুষ নহে বরং শয়তানের বংশধর। কেননা প্রত্যেক ফজিলত ও কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁহাকেই প্রদান করা হইয়াছে।" (হাকিকাতুল ওহী, পৃঃ ১১৪)

সংকলন ও অনুবাদ :

মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,

সদর মুরুব্বী।

খতমে নবুয়ত – রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) অনন্য মর্যাদা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[রাবওয়া মোকামে মসজিদে আকসায় ৩০ । ৩ । ৭৩ ইং তারিখে প্রদত্ত জুমার খোৎবা]

আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে কোরআনে-আযীমে নবুয়ত ও রিসালত সমন্ধে অনেক বুনিয়াদি কথা শিক্ষা দিয়াছেন। উহাদের মধ্যে আমি এখন কয়েকটি আলোচনা করিব।

আল্লাহতায়ালা এই কথা প্রথম আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, নবী ও রসুলগণের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

"তিলকার রুসুলু ফায্‌যালনা বা'যাহু আলা' বা'যিন।" (আল-বাকারাহ্‌, আয়াত ২৫৪)

অর্থাৎ—"এই রসুলগণের কাহাকেও কাহারও উপর আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।"

রিসালতের সাম্য ও বিশেষত্ব

ইহা ছাড়াঅন্য আয়াতে ও নবীগণ একে অন্যের চেয়ে বড় হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন বিষয় স্পষ্ট আলোচিত হইয়াছে এবং কোন কোন সূত্র হইতে জানা যায় যে, কোন কোন বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ধরা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্থলে, যেমন উল্লিখিত আয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের একটি এই কারণ বলা হইয়াছে যে, কোন কোন নবী শরীয়তের বাহক হন এবং কোন কোন নবী শরীয়ত আনয়ন করেন না। অন্যান্য স্থানে শ্রেষ্ঠত্বের অন্যান্য কারণ বর্ণিত আছে। কিন্তু সেগুলিকে এখন আমি স্মরণ করিতেছি না। এতদ্ব্যতীত, কোরআন করীম হইতে আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি এবং হযরত নবী আকরাম (সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী) সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন কোন ইরশাদের আলোকে জানা যায় যে, ফযিলতের কোন কোন দিক বা কারণ নিয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মোটকথা, যদিও কোন কোন রসুল অপেক্ষা কোন কোন রসুলকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে, তথাপি আমাদিগকে বলা হইয়াছে ঃ

"লা নুফাররেকু বাইনা আহাদিম মির-রুসুলিহি।" (আল-বাকারাহ, ২৮৬)

অর্থাৎ—"রিসালতের দিক হইতে রসুলে রসুলে কোন প্রভেদ নাই।' এই প্রকার আরও কোন কোন এই মর্মে আয়াত আছে। সুতরাং ফজিলতও আছে এবং রসুলগণের মধ্যে তারতম্যও করিতে নাই অর্থাৎ রিসালাত লাভের দিক হইতে কোনও পার্থক্য নাই।

যিনি শরীয়ত বাহক রসুল এবং যিনি কোন নুতন শরীয়ত-বাহক নহেন, উভয় প্রকারের রসুলগণের রসুল হইয়া আসায় কোনই প্রভেদ নাই। উভয়েই রসুল। আল্লাহতায়ালা তাঁহাদিগকে তাঁহার সর্বমুখী প্রজ্ঞা দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের জাতিগণের নিকট রসুল করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

এমনই যে, তাঁহাকে সমগ্র পৃথিবীর নিকট সকল সময়ের জন্য এবং সকল জাতির মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্য পাঠান হইয়াছে। ইহা সত্বেও প্রেরিত হওয়ার দিক হইতে তাঁহার মধ্যে এবং অন্য রসুলগণের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

সুতরাং রেসালতের মর্যাদায় ফযিলতও আছে এবং রসুল রূপে প্রেরিত হওয়ার দিক হইতে কোন পার্থক্যও নাই। রসুলগণ সম্পর্কীয় বুনিয়াদি বিষয়াবলীর মধ্যে এগুলি অন্যতম। এ সকলের বিস্তৃত আলোচলার মধ্যে এখন আমি যাইতে পারি না। হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যদি কোরআন আযীম শুধু রসুল বলিত তবে রিসালত হিসাবে হযরত আদম আলাইহেস সালাম ও হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না; হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সল্লোমের মধ্যে রসুল বা প্রেরিত হিসাবে কোনই প্রভেদ থাকিত না। যদিও ফযিলত যথা স্থানে থাকিত, তবু এত দেদীপ্যমান ফযিলত, যাহা সকল নবী হইতে তাঁহাকে পৃথক করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। এইজন্য কোরআন করীম যেমন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লামকে রসুল বলিয়া রিসালাতের মোকামে সব নবীর সমান স্থানে দাঁড় করাইয়াছে, তেমনি তাঁহাকে আর এক উচ্চ স্থান দিয়াছে, যাহা সুরা আহযাবের ৪১ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া তিনি রসুল ও খাতামুল—আম্বিয়া উভয়ই। খাতামুল আম্বিয়া বা খাতামুল-মুরসালীন, খতমে নুয়ত বা খতমে রিসালাতের মোকামকে ইসলামী পরিভাষায় মোকামে মোহাম্মদীয়ত বলা হয় এবং ইহাতে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অদ্বিতীয়। ইহা সেই ফযিলত নহে যাহা, "ফায্যালনা বা'যাহুম আলা' বা'যিন' বলিয়া প্রতিয়মান আয়াতে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বেরও তুলনামূলকভাবে প্রথম ও শেষ আছে। যদি রিসালত হিসাবে কোনও প্রভেদ নাও থাকে এবং মানসচক্ষে সব নবী এক মাঠে দাঁড়ান, তবে পুর্ব দিক হইতে দেখিলে উত্তর দিকে যিনি, তিনি শেষ, এবং দক্ষিণ দিক হইতে দেখিলে পশ্চিম কোনস্থ নবী শেষ নবী। সুতরাং আপেক্ষিক বিচারে এই এক প্রকার শেষ আছে। ইহাতে কোন ফযিলতের কথা নাই। ইহা একটি আপেক্ষিক বিষয়। যে কোন্ হইতে দেখিবেন, সম্মুখস্থ শেষ প্রান্তই শেষ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

খাতামান নবীয়ীন কেন?

সুতরাং "ফায্যালনা বা যাহুম আলা বা'যিন"—আয়াতে বর্ণিত বিয়য় যেমন একটি বুনিয়াদি সত্য, তেমনি "লা নুযাররেকা বাইনা আহাদীম মির-রুসুলিহি" নিজ স্থানে একটি মূল সত্য। বস্তুতঃ হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের, তাঁহার স্রষ্টা ও প্রভুর নিকট যে স্থান, তাহা প্রকাশার্থে তাঁহাকে 'খাতামান-নবীয়ীন' বলা হইয়াছে। 'খাতামান্নাবী-য়ীন' অর্থাৎ মোহাম্মদীয়তের মোকাম পূর্ণতম ঐশী নৈকট্য লাভের মোকাম। অন্য কথায়, তিনি স্রষ্টার গুণাবলীর পূর্ণতম প্রকাশস্থল। এই মর্যাদা শুধু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামই লাভ করিয়াছেন। অন্য কোন নবী এই মর্যাদায় পৌঁছিতে পারেন নাই। বলা হয় যে রিসালতের গণ্ডির মধ্যে একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আমরা যেন পার্থক্য না করি কিন্তু মুহাম্মদীয়তের মোকামের দিক হইতে তিনি যে স্থানে অধিষ্ঠিত, উহা স্রষ্টার গুণাবলীর পূর্ণতম প্রকাশকের মোকাম। এই মোকামকে সব মানুষের তুলনায় ইনসানে কামেল (বা পূর্ণতম মানুষ) বলা হয় এবং নৈকট্য লাভের দিক দিয়া আল্লাহ্-তায়ালার অধিকতর নিকট অন্য কেহ নাই—অন্য কোন ব্যাক্তি খোদার প্রেম লাভে তাঁহার চেয়ে অধিক নিকট নহে এবং হইতেও পারে না। এই 'মোকামে মোহাম্মদীয়ত' ব্যাখ্যার্থে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং, সুরাহ্ আহজাবের ৪১ আয়াতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অন্যান্য রসুলগণের ন্যায় এক রসুল এবং এই দিক দিয়া রসুল রসুলের মধ্যে তারতম্য করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়, তিনি খাতামান নাবীয়ীন। এই দিক দিয়া তিনি অদ্বিতীয় এবং কোন রসুল তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এই হিসাবে কাহাকেও তাঁহার সহিত সংযুক্ত করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। এই মোকামে-মোহাম্মদীয়তের দিক দিয়া তিনি সব রসুলের মধ্যে অদ্বিতীয় বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন।

সুরাহ্ আহযাবের এই মহিমাময় আয়াতের শেষে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

"ওয়া কানাল্লালু বে-কুল্লে শাইয়েন আলীম।"

—"সব বিষয়ের সম্যক জ্ঞান আল্লাহতায়ালার রহিয়াছে।" ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই বিবৃতির এক গভীর ও জরুরী সম্বন্ধ হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খতমে-নবুয়ত অর্থাৎ মোহাম্মদীয়তের মোকামের সহিত রহিয়াছে ; নতুবা বাহ্যতঃ একথা বলিয়া যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দৈহিক রূপে কোন পুরুষের পিতা নহেন, কিন্তু (১) আল্লাহ্র রসুল এবং (২) খাতামান্নবিয়ীন—আবার ইহা বলা যে, "সব বিষয়ের সম্যক জ্ঞান আল্লাহতায়ার রহিয়াছে"—ইহাতে কোন হেকমত থাকা চাই, ইহাতে কোন গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিহিত থাকা চাই।

আমার মতে অন্য সব অর্থ ছাড়া একটি অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালা আলোচ্য আয়াতে-করীমায় বলেন যে, খাতামান্নাবীয়ীনের অর্থ নিজ হইতে করিবে না। খতমে-নবুয়তের অর্থ তোমাদের স্রষ্টা, পালন-কর্তা ও ক্রমোন্নতি-দাতা—রাব্ব তোমাদিগকে নিজে শিক্ষা দিবেন। সেজন্য স্বয়ং কুরআন করীম ইহার অর্থ করিয়াছে। সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

'রাফায়া বা'যাহুম দারাজাতিন' (আল-বাকারাহ ঃ ২৫৪)

ইহার এক অর্থ হইল, আল্লাহতায়ালা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রাব্বে করীমের আরশ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রদান করিয়াছেন। কোরআন করীমের প্রত্যেক আয়াত, প্রত্যেক বাক্যের এবং প্রত্যেক শব্দের অনেক মর্ম আছে। হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহেস সালাম ইহার ["রাকাআ বাজাহুম্ দারাজাত" বাক্যের—অনুবাদক] এক অর্থ করিয়াছেন, যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সেই রসুল যিনি তাঁহার মর্যাদার দিক দিয়া সব রসুলের উর্ধ্বে এবং আধ্যাত্মিক উচ্চতায় অদ্বিতীয়, কোন রসুল এই মোকামে তাঁহার শরীক নহেন।

কুরআন করীমের অন্য এক স্থানে আল্লাহতায়ালা বলেন :—"ইন্নাকা লা-আলা খুলুকিন আযিম" (আল-কালাম : ৫)

অর্থাৎ, "আল্লাহতায়ার গুণে গুণান্বিত" হওয়ার মোকামে অন্য মানুষ দূরে যাউব, অন্য নবীও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন না—বরং কোন মানুষ তাঁহার মোকামের নিকটেও পৌঁছিতে পারে না। ইহা তাঁহার মুহাম্মদীয়তের মোকাম। ইহাতে তিনি সব রসূল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার কালাম খোদার কালাম ও তাঁহার প্রকাশ খোদার প্রকাশ এবং তাঁহার আগমন খোদার আগমন। (পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে এই বিষয় এই প্রকারেই বর্ণিত হইয়াছে)। খোদাতায়ালা বলেন : "জায়াল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল" (বনি-ইস্রাইল : ৮২)

এই আয়াতে করিমার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া হযরত মসিহ মওউদ আলাইহেস সালাম বলেন যে, 'হক' শব্দে বুঝায় আল্লাহতায়লা, কুরআন আজীমের শেষ ও পূর্ণ শরীয়ত এবং হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম—এই তিনের প্রত্যেককেই বুঝায়। ইহাদের জন্য 'হক' শব্দ প্রকৃত অর্থে প্রযোজ্য।

মে'রাজ ও মোহাম্মদীয়াতের মোকাম :

কুরআন করীম মোকামে-মুহাম্মদীয়ত অর্থাৎ উল্লেখিত অনন্য ও অদ্বিতীয় মোকামকে বিভিন্ন প্রকারে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বর্ণনা করিয়াছে, যেমন, আমাদের ন্যায় অসহায় বান্দাগণকে মুহাম্মদীয়াতের মোকামের মর্ম বুঝাইবার জন্য আল্লাহতায়ালা হযরত নবী আকরাম সাঃ-কে মেরাজ দ্বারা সমাদৃত করেন। ইহার দ্বারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মুহাম্মদীয়াতের মোকাম তথা খাতামান নাবীয়ীন হওয়ার মোকাম এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য নবীগণের সহিত তাঁহার আপেক্ষিক সম্বন্ধ সব কিছুই প্রাঞ্জল হইয়া পড়ে। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) তাঁহার 'তফসীরে সগীরে'র নোটের বলিয়াছেন যে, মে'রাজে মোহাম্মদীয়াতের মোকামের হকীকত বর্ণিত হইয়াছে।

মে'রাজের মাধ্যমে মুসলমান জাতি তথা পৃথিবীবাসীর নিকট এই চিত্র উপস্থাপিত হইয়াছে যে, তোমাদের পার্থিব মোকাম হইতে উর্ধে দৃষ্টিপাত কর, প্রথম আকাশে তোমরা হযরত আদম (আঃ)-কে পাইবে, দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-কে দেখিবে, তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখিবে, চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরীস (আঃ)-কে দেখিবে, পঞ্চম আকাশে দেখিবে হযরত হারুন আঃ-কে, ষষ্ঠ আকাশে শরীয়তদাতা নবী হযরত মুসা আঃ-কে এবং সপ্তম আকাশে গয়ের তশরীয়ী নবী হযরত ইব্রাহীম আঃ-কে দেখিতে পাইবে। ইহারও উর্ধে রাব্বে-করীমের আরশে হযরত মুহাম্মদ—খাতামান নাবীয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। অন্য কথায়, মেরাজের হকিকতের দিক দিয়া হযরত নবী আকরাম সাঃ-এর মোকাম হইল আরশ-ই-রাব্বে-করীম; ইহাও বলিতে পারি যে সাম্যক পূর্ণ সদগুণে গুণান্বিত ; খোদা তাঁহাকে উলুহিয়তের মজহার-ই-আতাম (ঈশ্বরত্বের পূর্ণতম প্রকাশ) রূপে সৃষ্টি করিয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন। মে'রাজের হকিকত বা মূল-

তত্ত্ব রূপকের ভাষায় বর্ণিত ; ইহাই খতমে-নবুয়ত। আঁ-হযরত (সাঃ) আরশের অধিপতি খোদা-ই-জুল-আরশের ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট। ইহা তাঁহার মোকামের দিক হইতে আপন খোদার সহিত সেই প্রেমের ফল যাহার দ্বারা তাঁহাকে সমাদৃত করা হইয়াছিল। ইহাই সেই খতমে নবুয়ত যাহা খোদাতায়ালা তাঁহাকে দিয়াছেন।

কোন আকাশে একজন করিয়া কোন আকাশে দুইজন করিয়া নবীর যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে উহা শুধু নবীগণের দলের আলামত হিসাবে বলা হইয়াছে। কারণ যদি প্রকৃতই এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন তবে প্রথম আকাশে হযরত আদম আঃ-এর সঙ্গে আরও অনেক নবী থাকিবেন। অন্য আকাশগুলিতেও, এমন কি সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া এই আম্বিয়া শেষ হইয়া যাইবেন। ইহার পর একমাত্র সত্তা (সাঃ থাকিয়া যান যিনি তাঁহার রবের সহিত এমনভাবে মিলিত ও বিলুপ্ত হইয়া যান যে, তাঁহার আগমন খোদার আগমন, তাঁহার বাক্যালাপ খোদার বাক্যালাপ এবং তাঁহার ক্রিয়া খোদার ক্রিয়া বলিয়া গন্য। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এই বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, বদর যুদ্ধে যে কঙ্কর মুষ্টি নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তাহা দোয়ার ফল নহে বরং তাঁহার ঐশী-নৈকট্যের ফল ছিল এবং তিনি স্রষ্টার গুণাবলীর পূর্ণতম প্রকাশক হওয়ার কারণে ছিল। ইহা তাঁহার উচ্চ মোকামের ক্রিয়া ছিল। উহা কাফেরদের চোখে পড়িয়া ছিল এবং তাহাদের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল।

উপরে বর্ণিত চিত্রে এই মোকাম অর্থাৎ রাব্ব-ই-করীমের আরশে স্থাপিত মোকাম-ই-মোহাম্মদীয়াত বা মোকাম-ই-খাতামুল মুরসালীন বা মোকাম-ই-খাতামান নাবীয়ীন প্রকৃতপক্ষে এতই উচ্চ যে সেখানে অন্য কোন মানুষ পৌঁছিতে পারে না। ইহা সেই মোকাম এবং মোকাম প্রাপ্ত ব্যক্তি যাঁহার জন্য সারা বিশ্বের সৃষ্টি। হাদীসে কুদসী "লাও লাকা লামা খালাকতুল আফ্‌লাকা" অর্থাৎ ' তোমাকে সৃষ্টি না করিলে আকাশ সমূহ সৃজন করিতাম না" এই হকিকতই প্রকাশ করিতেছে। সেজন্যই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এই মোকাম সেই সময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যখন হযরত আদম জন্মগ্রহণ করেন নাই। আঁ-হযরত (সাঃ) নিজে বলিয়াছেন যে তিনি সেই সময়েও খাতামান নাবীয়ীন ছিলেন যখন আদম মৃত্তিকার মধ্যে পার্শ্ব পরিবতন করিতেছিলেন। (মুসনাদ আহ্‌মদ ; কানফুল উম্মান ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১১২ ইহাই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শান। ইহাই তাঁর শেষ মোকাম।

আখেরী নবী ঃ

"লা নুফাররেকু বাইনা আহাদিম মির রসুলিহী" আয়াতে আঁ-হযরত সাঃ)-কে রসুল গণের মধ্যে অন্যতম রসুল বলা হইয়াছে। ইহা সেই মোকাম যাহা সুরা আহযাবের আয়াতে করীমার মধ্যে "ওয়া লাকির রসুলুল্লাহে"—অংশে বলা হইয়াছে। অতঃপর তাঁহাকে খাতামান নাবীয়ীন বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি এমন রসুল যে তিনিই খাতামান নাবীয়ীন—যে দিক দিয়া তিনি সব রসুল হইতে পৃথক এবং অদ্বিতীয়। তাই 'ফাজ্জালনা বাযাজাহুম আলা বা'জিন'—আয়াতকে 'লা নুফাররেকু বাইনা আহাদিম মির রসুলিহী'—আয়াত বা আয়াতাংশ রহিত করে নাই। প্রথমোক্ত আয়াত স্বস্থানে ঠিক এবং অদ্বিতীয় আয়াতও

নিজ জায়গায় ঠিক। রিসালত হিসাবে কোনই প্রভেদ নাই। প্রেরিত হওয়ার দিক দিয়া তাঁহার এবং আদমের (আঃ) মধ্যে কোন প্রভেদ করা যায় না। কিন্তু তিনি শুধু একজন রসুলই নহেন, বরং খাতামান নাবীয়ীনও। খাতামান নাবীয়ীনের অত্যুচ্চ মোকামের দিক হইতে অন্য কোন নবী এই দাবী করিতে সাহস করিতে পারেন না। এ বিষয়ে আঁ-হযরত (সাঃ) অদ্বিতীয়। তাঁহার মোকাম মহামহিমান্বিত খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে—রাব্বে করীমের আরশের উপর, যাহাকে আমরা মোকামে মোহাম্মদীয়ত বলি। এই অর্থে তিনি আযীমুশশাম আখেরী নবী। আমরা খোলা চোখে দিব্য দৃষ্টিতে যুক্তি প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁহার 'আখেরী নবী' হওয়াতে ঈমান রাখি। মে'রাজের অনিস্বীকার্য মহান আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানে প্রকাশ্য মোকামে-মোহাম্মদীয়াত বা খতমে নবুয়তের মোকাম (যাহা সুরা আহযাবে বর্ণিত হইয়াছে) অদ্বিতীয় মোকাম হওয়ার দিক দিয়া তিনি আখেরী নবী এবং খাতামুন-নাবীয়ীন ও খাতামুল-মুরসালীন।

যে বুনিয়াদী হকিকত মে'রাজের রাত্রে মানবজাতিকে দেখানো হয় তাহ এই শিক্ষা দেয় যে, মোহাম্মদীয়াতের মোকাম রাব্বে করীমের আরশে স্থাপিত। যদি নবী আকরাম (সাঃ)-এর উম্মতে কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতী করিতে করিতে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ-এর পার্শ্বে স্থান লাভ করেন, তবু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আখেরী নবী হওয়ায় কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। কারণ খতমে নবুয়তের মোকাম সপ্তম আকশ নয়, বরং অনেক উর্ধে – সেখানে কাহারও যাওয়ার প্রশ্নই উঠে ন। কাহারও আরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া মানব স্বভাব বিরুদ্ধ। কারণ মানব প্রকৃতির নির্যাস আঁ-হযরত (সাঃ)। তাঁহার (সাঃ) মোকাম "মোহাম্মীয়তের মোকাম, যাহা রাব্বে করীমের আরশ। যদি কোন উম্মতী তাঁহার অনুবর্তীতায় সপ্তম আকাশেও পৌছেন, তবে তাহা খতমে নবুয়তে কিভাবে বিঘ্ন ঘটাইবে? তখমে নবুয়তের মোকাম তো সপ্তম আকাশ নয়। বরং অনেক উর্ধ্বে-অনেক উপরে এবং খতমে নবুয়ত—অর্থাৎ মোকামে মুহাম্মদীয়তের পর আর কোন কিছু নাই। মহা সম্মানিত রাব্বে করীমের আরশের পর আর কোন মোকাম নাই। সেখানে কাহারও যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। উহার নীচে থাকাতে খতমে নবুয়তের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। দৃষ্টান্ত স্থলে, আমাদের সম্মুখে পাহাড় আছে। এক ব্যক্তি সব চেয়ে উচ্চ প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সেখানে কেবল একটি মানুষ দাঁড়াইতে পারে। এখন নিম্ন হইতে আরও এক ব্যক্তি উপরে উঠিতেছে। লঠিতে উঠিতে সে ঐ স্থানে উঠিতে পারে না। সে দশগজ নীচে থাকিয়া যায়। তাহার দশ গজ নীচে স্থান পাওয়ার এই অর্থ নয় যে, প্রথম ব্যক্তি পাহাড়ে শেষ ও ও সর্বোচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া নাই।

"আখেরী নবী"

সুতরাং আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আখেরী নবী মানি। বস্তুতঃ উক্ত অর্থে হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে—(তিনি আমাদের মহবুব ও প্রিয়)—আখেরী নবী জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে,

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সত্যিকার অনুবর্তিতা সত্বেও কেহ প্রথম আকাশে যাইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন দ্বিতীয় আকাশেও যাইতে পারে না—এরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম আকাশেও যাইতে পারে না। অথচ যদি তাঁহার উম্মত হইতে কোন ব্যক্তি হযরত আদম (আঃ)-এর মর্যাদা ও পর্যায়ে উন্নীত হয় তবে মুহাম্মদীয়তের মেকোমের কি ক্ষতি হয়? এই আধ্যাত্মিক উন্নতি আঁ-হযরত (সাঃ) এর ছয়/সাত আকাশ নীচে অবস্থিত। সেইরূপ যদি কোন ব্যক্তি সপ্তম আকাশেও পৌছে (যাহার সুসংবাদ হাদীসে দেওয়া হইয়াছে) তবে ক্ষতি কি? যদি হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর মোকাম পর্যন্ত পেঁাছানোর ফলে খতমে নবুয়তের উপর কোন কুপ্রভাব পড়ে তবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বয়ং ইহা করিয়াছেন—অন্য কাহারও বিপর্যয় ঘটাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বিপর্যয় নহে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কুরবানীর তাৎপর্য ঃ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর রোইয়া (স্বপ্ন)-এর ফলে এবং তাঁহার কুরবানীর ফলে 'আত্মোৎসর্গকারী' এক জাতি গঠিত হইয়াছিল, যাহাদিগকে হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্বর্ধনার্থে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উচ্চ মোকামের উদ্দেশ্যে আপন পুত্র হযরত ইসমাইল আলাইহেস সালামকে কুরবানী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কোন্ জিনিসের জন্য তিনি কুরবানী করিতে প্রস্তুত হইয়ালেন? খোদা বলিয়াছিলেন ঃ আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আমার আরশের উচ্চতা লাভ করিবার পর আমার ডান পার্শ্বে যিনি বসিবেন তিনি তোমার বংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন, সেজন্য আল্লাহ্তায়ালার হাম্দ করিতে করিতে নিজ বংশকে এই অদ্বিতীয় ও মর্যাদাবান পুরুষের জন্য কোরবানী কর। যদিও ইহার অর্থ অন্য কিছু ছিল, কিন্তু হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম বাহ্যতঃ তাঁহার পুত্রকে কুরবানী করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

ইহার অর্থ ছিল—ইতিহাসও আমাদিগকে ইহাই জানায় যে, হযরত ইব্রাহিম আলাইহেস সালামের বংশধর শত শত বৎসর পর্যন্ত হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অভ্যর্থনার্থে প্রস্তুতি করিয়াছিল। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন স্থানে ডি, সি আসার কথা থাকিলে ৩/৪ দিন পূর্ব হইতে প্রস্তুতি চলে। কমিশনার সাহেবের জন্য ৮/১০ দিন পুর্বে এবং রাষ্ট্র প্রধান হইলে তাঁহার সম্বর্ধনার্থে লোকে কয়েক মাস পূর্ব হইতে তৈরী শুরু করে। কিন্তু সেই মহাপুরুষ, যাঁহার তুলনায় যাঁহার চেয়ে অধিকতর মর্যাদাবান কোন মানুষ পয়দা হওয়ার ছিল না, তাঁহার অভ্যর্থনার্থে অনেক শতাব্দী ব্যাপী প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য এরূপ একটি জাতি তৈরী করিবার প্রয়োজন ছিল, যাহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবে এবং তাঁহার (সাঃ) পবিত্র শক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রভাব গ্রহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে, তাহাদের কার্য দ্বারা প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস

সালাম যেমন তাঁহার পুত্রকে খোদার পথে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন তেমনি তাহারাও তাহাদের বংশধরগণকে হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদ-মূলে খোদার জন্য কোরবানী করিতে প্রস্তুত। এই সেই মহান কুরবানী * যাহার জন্য হযরত ইসমাইল আলাইহেস সালামের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল এবং ইহা সেই মহাকুরবানী, যাহার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত ইসলামের প্রাথমিক যুগে পাওয়া যায়। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম, ইসলাম ও তাঁহার মিশনের আত্ম রক্ষামূলক রণক্ষেত্রে মস্তক দানের দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মহাকুরবানীর উজ্জল দৃষ্টান্ত! এক জাতি তৈরী করিবার আদেশ ছিল, যাঁহারা খোদার পথে প্রাণদান করিবেন। এক শিশুর প্রাণ নেওয়ার কোন স্বার্থকতা নাই। বস্তুতঃ প্রাণ উৎস্বর্গকারী এক জাতি তৈরী হইল। তাঁহাদের কেহ কেহ বদর প্রান্তে শহীদ হইয়াছিলেন। তারপর উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তারপর একের পর অন্য প্রত্যেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা শহীদ হইতে থাকেন। তাঁহারা আরবেয় রণাঙ্গণ সমূহে ক্রলাগত শহীদ হন। তাঁহারা ইরাণের রণক্ষেত্রগুলিতে শহীদ হন। তাঁহারা রোমের রণাঙ্গন সমূহে শহীদ হন। তাঁহারা মিশরের রণক্ষেত্রগুলিতে শহীদ হন। তাঁহারা পশ্চিম আফ্রিকার রণক্ষেত্র সমূহে শহীদ হন। তাঁহারা স্পেন হইতে অগ্রসর হইয়া ফ্রান্সের উত্তর অঞ্চল সমূহে উপস্থিত হন। তাঁহারা রোমে উপস্থিত হন। উহা তখন তুর্কির অন্তর্গত ছিল। তারপর পোল্যাণ্ড পর্যন্ত উপস্থিত হন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণ খোদার পথে কুরবানী করিতে করিতে ভু-পৃষ্ঠকে রক্তে রঞ্জিত করেন।

সুতরাং এই সেই মহাকুরবানী যাহা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরগণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম আধ্যাতিক উন্নত মর্যাদা লাভের সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছানোর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোকামে-মোহাম্মদীয়াতে কোন বিপর্যয় না ঘটিয়া বরং তাঁহার মহা আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহে সাহায্যকারী ও সহায়ক হইয়াছিল। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালাম যেমন তাঁহার বংশধরগণকে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যদি তেমনই আজও তাঁহার কোন রূহানী পুত্র এমন জামাত তৈরী করিবার জন্য দাঁড়ান, যাঁহারা হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামের বংশধরগণের ন্যায় হযরত নবী আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন এবং ইহার ফলে সেই ব্যাক্তি, অর্থাৎ হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহা-গৌরবান্বিত এই আধ্যাত্রিক পুত্র হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) সহিত সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছেন, তবে কোন মুর্খই বলিবে যে, ইহাতে খাতামান-নাবীয়ীনের মধ্যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে ও

---

*সুরাহ সাফ্‌ফাত : ১০, ১০৮—[এবং আমরা ইসমাইলের 'ফিদিয়া' এক মহা-কুরবানী দ্বারা করিলাম]—অনুবাদক।

তাঁহার মর্যাদা ব্যাহত হইয়াছে। পুর্ববর্তীগণের কারণেও ব্যাঘাত হয় নাই এবং পরবর্তী উম্মতি যিল্লি নবীর আগমনেও কোন বিপর্যয় ঘটিতে পারে না। আখেরী নবীর ইহাই সেই মোকাম, অর্থাৎ মোহাম্মদীয়তের মোকাম, যাহার দিক হইতে আমরা হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আখরী নবী বলিয়া জানি এবং আমরা তাঁহার এই বাণীর উপর একীন রাখি যে, 'দেখ, তোমাদের মধ্যে যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করিবে আল্লাহতায়ালা তাহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উচ্চতা দিবেন। কিন্তু এমন এক ব্যক্তিও হইবেন

"ইযা তাওয়াযায়াল আবত্থ রাফায়াহুল্লাহু ইলাস্-সামায়েস-সাবেয়াতে।" (মুসলিম শরীফ) যাঁহার বিনয় ও নম্রতা, যাঁহার মোহাম্মদ (সাঃ-এ বিলীন হওয়া শেষ সীমানায় পৌঁছার মোকাম (— সপ্তম আকাশ) দ্বারা সমাদৃত হইবেন। প্রকৃত পক্ষে বিনয় ও নম্রতা প্রেমের ফলে জন্মে। সুতরাং যাঁহার এই অবস্থা হইবে তাঁহার সম্বন্ধে খোদা ওয়াদা করিয়াছেন যে, "রাফায়াহু-ল্লাহু ইলাস সামায়েস সাবেয়াতে"—আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছাইবেন এবং তাঁহাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পার্শ্বে দাঁড় করাইবেন।

সুতরাং, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আধ্যাত্মিক উচ্চতার দিক হইতে সপ্তম আকাশে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পবিত্র পুরুষ যিনি রাব্ব-ই-করীমের আরশে স্থান পাওয়া নির্ধারিত ছিল এবং খতমে নবুয়ত দ্বার মহাসম্মানিত হওয়া নির্দিষ্ট ছিল, হযরত ইব্রাহীম (আঃ-এর উচ্চ স্থান লাভ দ্বারা তাঁহার (সাঃ এই মোকামে দোষের কিছু ছিল না। ইত্যাবস্থায় তাঁহার (সাঃ) 'সেই রুহানী পুত্র' যিনি তাঁহার জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর জন্য কোরবানী করিয়াছিলেন এবং ইসলামের প্রধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহার আন্তরিক আকুলতা, খোদা ও রসুলের জন্য যাঁহার আন্তরিক প্রেম এবং যাঁহার আবেগময় আকুল প্রার্থনা ও দোওয়া এমন এক জাতি সৃষ্টি করিয়াছে, যাহারা সারা জগতের সহিত সংগ্রামকে কবুল করিয়া লইয়াছে, কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সহিত প্রেম-সম্পর্ক ছিন্ন করে নাই, সেই গৌরবান্বিত পুত্র তাঁহার আধ্যাত্মিক মর্যাদার উর্ধগতির ফলে সপ্তম আকাশে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পদ-তলে আছেন বলিয়া খতমে-নবুয়তে কিরূপে ব্যাঘাত ঘটিল — ইহা একটা বুঝিবার বিষয়। আল্লাহতায়ালা লোকদের বুঝার তওফিক দিন।

বাকী, আমরা বুঝি, যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝে না, সে আসলে বিদ্বেষ, মুর্খতা, সংস্কার বা আধ্যাত্মিক শক্তির অভাবে এইরূপ করে। কারণ মোহাম্মদীয় উম্মতের উলেমাবৃন্দ দুই মমা-সম্প্রদায়ে বিভক্ত দেখা যায়। উলামা-ই-জাহের ও উলামা-ই-বাতেন। পূর্ব-বর্তীগণও তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহাই বলিয়াছেন এবং এখনও ইহাই বলা যায়। এক দল তাঁহারা, যাহাদিগকে খোদাতায়ালা কোরআন করীম শিক্ষা দিয়াছেন এবং অন্য দল, যাহারা খোদার শিক্ষাকে স্মরণ রাখিয়াছেন, কতকটা বুঝিয়া ও কতকটা না বুঝিয়া। আমি এখন ইহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি না। যাহা হউক, আমরাও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে খাতামুল-আম্বিয়া এবং আখেরী নবী মানি এবং দৃঢ় প্রত্যয় ও অটল বিশ্বাস

রাখি যে, কোন ব্যক্তি রুহানী উচ্চতার দিক হইতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম আকাশে পৌঁছিলেও খতমে নবুয়তের মোকামে ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না। সপ্তম আকাশে পৌঁছিয়াও তাহার স্থান হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মোকামের নীচে, কিন্তু তাঁহার মোকামের সব চেয়ে নিকটের মোকাম। কারণ, ষষ্ঠ আকাশ হযরত মুসা (আঃ)-এর মোকাম এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মোকামের মধ্যে পুরাপুরি একটি আকাশ – সপ্তম আকাশের ব্যবধান। হযরত মুসা (আঃ) সেই নৈকট্য লাভ করিতে পারেন নাই, যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) লাভ করেন। এই কারণেই তাঁহার হৃদয়ে যখন এই আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, তিনি সেই জ্যোতি-প্রভা দেখিবেন, যাহা রসুল আকরাম (সাঃ)-এর উপর নাজেল হওয়া নির্ধারিত ছিল, তখন উহার সহস্রাংশেরও কম ঝলকের ফলে "খার্‌রা মুসা সায়েকা" (আল-আ'রাফ অর্থাৎ, "হযরত মুসা (আঃ) মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।" [আল-আ'রাফ] আল্লাহতায়ালা জগদ্বাসীকে এই দৃশ্য দেখাইয়াছেন কিন্তু যিনি সপ্তম আশাশে পৌঁছিয়াছেন, তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর পদ-মুলে উপবিষ্ট, তাঁহার নীচে, উপরে নহে ; যিনি বলেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর শেষ চরম ও পরম নৈকট্যে তাঁহার পদ-ধুলায় উপবিষ্ট হওয়াকে তিনি গৌরব মনে করেন, তিনি তাঁহার (সাঃ) সম্মানের বিরোধী-কথা বলেন – কি প্রকারে মনে করা যাইতে পারে? তিনি তাঁহার (সাঃ) প্রেমে বিলীন। তাঁহার আত্মা আঁ-হযরত (সাঃ-এর সাথে মিলিত। তিনি তাঁহার সকল সময় তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়া ছিলেন এবং বিনীত ভাবে ইসলামের খেদমতের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র শক্তি, তাঁহার কুওয়তে-কুদ্‌সিয়া (পবিত্রকরণ শক্তি কাজ করিতে ছিল। তাঁহার কায়েম করা জামাত আজও এই কথায় গর্বানুভব করে যে, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে তেমনি মনোনীত করিয়াছেন যেভাবে পূর্বেকার লোকদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন সেই স্বপ্ন যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখান হইয়াছিল, উহা পুনরায় সফল হয়। পৃথিবী আবার আত্মবলিদান ও আত্মোৎসর্গের নমুনা দেখে। পূর্বে যেমন ইসলাম তখনকার জানা দুনিয়ায় জয়যুক্ত হইয়াছিল, তেমনি এখন আবার মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এই আত্মোৎসর্গ-কারী জামাতের কুরবানীর ফলে ইসলাম সমগ্র জ্ঞাত পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং ইহা সেই উদ্দেশ্য, যাহার জন্য আমাকে ও আপনাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। (অসমাপ্ত)

অনুবাদঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ [আঃ] বলেনঃ

"আমার এবং আমার জামাতের উপর যে দোষারোপ করা হয় যে, আমরা রসুলুল্লাহ [সাঃ]-কে খাতামুন্নাবীয়ীন বলিয়া মানি না – ইহা আমাদের উপর এক জঘন্য মিথ্যা অপবাদ বই আর কিছুই নয়। আমরা যে শক্তি বা দৃঢ় বিশ্বাস এবং তত্ব ও তথ্যপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লামকে খাতামুন্নাবীয়ীন বলিয়া মানি এবং সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করি, উহার এক লাখের এক ভাগ বিশ্বাসও ইহারা পোষণ করেন না।"

[আল-হাকাম ১৭ই মার্চ ১৯০১ ইং]

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গত ইং ৪।১।৮০ তারিখে হুজুর আকদাস (আঃ)-এর খেদমতে জনাব আমীর সাহেব নিবেদন করিয়াছিলেন যে ঢাকা মসজিদ ও গেষ্ট হাউস সমাপ্তির পথে। বাংলাদেশের জামাতে আহমদীয়ার সকল সদস্যের বিশেষ আগ্রহ যে হুজুর আকদাস (আইঃ) নিজ হস্ত মোবারক দ্বারা এই মসজিদের উদ্বোধন করিবেন। যেহেতু ইহাতে বিলম্ব হইবে, অথচ জামাতের কাজের সুবিধার জন্য মসজিদের নিম্নতল অবিলম্বে ব্যবহার করা প্রয়োজন, সেইজন্য মসজিদের বা-কায়দা উদ্বোধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মসজিদের পেছন অংশে নামাজ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। হুজুর আকদাস (আইঃ) ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছেন। উহা সকলের অবগতির জন্য নিম্নে দেওয়া হইল :

R A B W A H.
Dated 15. 1. 1980

Dear Maulvi Mohammad Sahib,
Assalamo Alaikum.

I am in receipt of your letter dated 4 Sulah 1359/Jan 1980 You should continue saying prayers in the rear portion of the mosque and need not wait for a formal opening ceremony. May Allah help you and bless your efforts with great success. He may enable you to complete the remaining work of Dacca mosque and the guest house as soon as possible. Ameen

Yours affectionately,
(Mirza Nasir Ahmad)
Khalifatul Masih

হুজুর (আইঃ)-এর উক্ত অনুমতি অনুযায়ী ইন্‌শাআল্লাহ্ আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ জুময়ার দিন হইতে সকল নামাজ দ্বিতল মসজিদালয়ে প্রথম অংশ বাদ দিয়া পেছন অংশে পড়া শুরু হইবে। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন। ওয়াস-সালাম

খাকসার—
ভিজির আলী
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

সিরাতুন্নবী

[হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উর্দু না'ত হইতে ভাবানুবাদ]

১। আমাদেরই নবী-নায়ক-নূরে বিশ্ব আলোকময়
নাম মোহাম্মদ (সাঃ) নাম মোহাম্মদ (সাঃ) প্রশংসিত প্রেমময়।

২। পবিত্র সব পয়গম্বর, এক হ'তে এক শ্রেষ্ঠতর
খোদার পরেই শ্রেষ্ঠ তিনি নবী-শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর (সাঃ)।

৩। সুন্দররোত্তম "পুষ্প-সুন্দর" পূর্ণ করেন সবার সাধ
'সবার দৃষ্টি তাঁহার' 'পরে "বদরুদ্দোজা" পূর্ণ চাঁদ।

৪। পথ হারাদের পথ দেখিয়ে ভব-সাগর করছেন পার।
আমি তাঁরই পথ ধরেছি, তিনই মোদের মঞ্জিধার।

৫। "লুক্কায়িতের" পর্দা খোলে দেখান যিনি গোপন পথ
প্রাণে প্রাণে প্রাণের বন্ধুর পূরণ করেন মনোরথ

৬। বন্ধো ওগো গোপন প্রিয় নিবাস-বিহীন লুক্কায়িত
চেহারা তোমার দেখান তিনি—তিনিই বিশ্ব-প্রশংসিত।

৭। দ্বীন-দুনিয়ার বাদশাহ যিনি, নবীকুলের শিরের তাজ
প্রবিত্রায়, বিশ্বস্তায়, বিশ্ব-মানব আদর্শ আজ। (ক্রমশঃ)

চৌধুরী আব্দুল মতিন

ওষ্ঠ পুটে পায়রা 'সালাম আলায়েক' তোহফা নিয়ে
আসক্তি ও অনুরাগের পাখা মেলে উড়ল গিয়ে
আমার রবের প্রিয়তম নবীর প্রিয়-ওতন পানে
নবীকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান নেতার গুণ-গানে।

—[হযরত মসীহ মওউদ-ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আরবী কসীদা হইতে অনুদিত]

সালানা জলসায় যোগদানকারীগণের জন্য কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

১। ট্রেনে অথবা বাসে চলার সময় যাহাতে পকেটমারের কবলে না পড়েন, সেইজন্য সাবধান থাকিবেন এবং সর্বদা দরূদ, এস্তেগাফার ও যিক্‌রে ইলাহীতে রত থাকিবেন।

২। কাহাকেও টাকা-পয়সা দেওয়ার সময় আপনার মানিব্যাগ সর্ব সাধারণ্যে খুলিবেন না।

৩। মসজিদ ও রেষ্ট হাউসের নির্মান কাজের দ্রুত সমাপ্তির জন্য এই বৎসর মহিলাদের কোন জলসা হইবে না এবং মহিলাদের থাকা খাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থাও সেই জন্য করা হইবে না। কাজেই কোন ভগ্নি কোন অবস্থাতেই জলসায় আসিবেন না।

৪। সকল অবস্থায় মসজিদের আদব মানিয়া চলিবেন, ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং জলসার মনোরম পরিবেশ বজায় রাখিবেন। এ ব্যাপারে ছোটদেরকেও মনোযোগী করিবেন।

৫। কাহারও সহিত কোন বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হইবেন না এবং অজানা লোকের বন্ধুত্বেও ভুলিবেন না।

৬। জলসাগাহে থাকা কালীন নিজেদের জিনিসপত্র, সুটকেস ইত্যাদি নিজ তত্বাবধানে রাখিবেন এবং মনোযোগ সহকারে জলসার বক্তৃতাগুলি শুনিবেন।

৭। জলসা চলাকালীন সময়ে জলসাগাহে ঘুরা-ফেরা করিবেন না।

৮। আপনার খাওয়া দাওয়া বা অন্য কোন অসুবিধা হইলে আপনার স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের নিকট জানাইবেন। তিনি প্রয়োজনে জলসা ওয়েলফেয়ার সাব-কমিটির সহিত যোগাযোগ করিবেন।

৯। এমন কোন কাজ করিবেন না যাহাতে আপনার কোন ভাইয়ের অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

১০। জলসা চলাকালীন সময়ে চায়ের দোকানে ভিড় করিবেন না এবং নিজের বা বন্ধুদের দ্বারা কোন প্রকার হট্টগোল হইতে দিবেন না।

১১। প্রত্যেক নেক কাজে আহমদী আবাল-বৃদ্ধ বণিতা উত্তম নমুনা পেশ করিবেন এবং ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিবেন। ওয়াস্ সালাম।

খাকসার—

এ, কে, রেজাউল করিম

সেক্রেটারী, জলসা কমিটি

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

জলসায় আসার উদ্দেশ্যাবলী

"এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবেন না, ইহা সেই বিষয় যাহার ভিত্তি ঐকান্তিকরূপে সত্যের সমর্থন ও ইসলামের কলেমাকে গৌরবান্বিত করার এবং উহার বাণীর মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হইয়াছে। যথাসম্ভব সকল বন্ধুরই সালানা জলসায় যোগদান করা উচিত।"

"যথাসম্ভব বন্ধুগণের শুধু আল্লাহতায়ালার জন্য ধর্মীয় কথাবার্তা শুনার জন্য এবং দোয়াতে শরীক হওয়ার জন্য এই তারিখগুলিতে আসিয়া পড়া উচিত; এবং এই জলসার মধ্যে এই ধরনের হাকায়েক ও মায়ারেফ শুনানো হইবে যাহা ঈমান এবং একীনকে পরিপূর্ণ করার জন্য অতিশয় জরুরী। উপরন্তু বন্ধুগণের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হইবে এবং দোয়াতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং যথা সম্ভব আল্লাহ্ আরহামুর রাহেমীন যেন তাহাদিগকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনায়ন করেন সেই জন্য চেষ্টা করা হইবে।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৭ তম সালানা জলসা

আগামী ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং রোজ শনি ও রবিবার আহ্‌মদী পাড়াস্থ মসজিদ প্রাঙ্গণে আঞ্জুমানে আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ৫৭ তম সালনা জলসা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত জলসায় যোগদানের জন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

নিবেদক

মোঃ ইদ্রিস, প্রেসিডেন্ট,

আঞ্জোমানে আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press, for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca –1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫৭তম সালানা জলসা

স্থান ঃ আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণ

৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা

তারিখ ঃ ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ ইং
ঃ ২রা, ৩রা ও ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৮৬ বাং
ঃ ২৭, ২৮ ও ২৯শে রবিঃ আউঃ ১৪০০ হিঃ

শুক্রবার ঃ বিকাল ঃ ২-১৫ মিনিট হইতে ৬টা
শনিবার ঃ বিকাল ঃ ২-১৫ মিনিট হইতে ৬টা
রবিবার ঃ সকাল ঃ ৮-৩০ মিনিট হইতে ১২টা
বিকাল ঃ ২-১৫ মিনিট হইতে ৬টা

এই মহান ধর্মীয় সম্মেলনে জামাতে আহ্‌মদীয়ার বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও আলেমগণ আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব, কোরআন করীমের সৌন্দর্য, সিরাতে খাতামান্নাবিয়ীন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), খতমে নবুয়তের তাৎপর্য, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব ও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব, জামাতে আহ্‌মদীয়ার বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা, ইসলাম ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

অত্র পবিত্র জলসায় যোগদান করিয়া অশেষ সওয়াব হাসিল করুন।

আরজ গুজার—
ভিজির আলী
চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি

তাং—২১ | ১ | ৮০ ইং

বিঃ দ্রঃ—বাহিরের মেহমানগণ প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র সঙ্গে আনিবেন। তাঁহাদের